(৯)

শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামি।
ইচ্ছা করে পিতার বাড়ী কা'ল যাইব আমি ॥
কি দুঃখে যাবে দুর্গা কিছু কি আমার নাই।
দেখেছি তোমার কাঙ্গাল পিতার ঘর-দরজা নাই ॥
দুর্গা বলে আমি কৈলে পাছে দ্বন্দ্ব হবে।
সেই যে আমার কাঙ্গাল পিতা ভিখ্ মেঙ্গেছে কবে ॥
নানা দান পুণ্যবান্ দেবকার্য্য করে।
এক দফাতে কাঙ্গাল বটে ভাঙ নাই তাদের ঘরে ॥
নানা রসে ভুলে শেষে বল্‌ছেন ত্রিলোচন।
মর্ত্তো গিয়া কি আনিবে আমার কারণ ॥
গুটি পাঁচ সাত বিল্বপত্র এই আমি পাই।
দুর্গা বলে প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই ॥
এইরূপে নানা কথায় পোহাল রজনী।
সকালবেলা নায়ে চল্লেন জগৎজননী ॥
উল্কি-ফেঁাটা সিন্দুর-ছটা মুক্তা-বাঁধা কেশে।
সোনার ঝাঁপা কনকচাঁপা শিব ভুলেছেন বেশে ॥

(১০)

চল্লেন বাপের বাড়ী দেবী ভগবতী।
সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশ আর লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
জয়া বিজয়া চল্লেন দিয়া দরশন।
গুপ্তবেশে চল্লো শেষে দেব পঞ্চানন ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়ের গান

(১)

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ।
শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
বলে কৈ মা উমা কৈ ॥

---

* বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়—পৃঃ ১৯০০—১৯০৪।

কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে॥

কৈ মেয়ে ব'লে আনতে গিয়েছিলে,
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে এলাম আপনা হ'তে, গেলে নাকো নিতে,
রব না গো যাব দু'দিন গেলে॥

পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা মায়া কি পাসরি,
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,
তোর কি মা নাই তোর কি মা নাই,
অমনি সরমে ম'রে যাই।
তাদের বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥

আমার মনের ব্যথা আছে মনে গাঁথা,
মা কি বলিবে অন্যে পিতৃদত্তা কন্যে
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
এ কি কবার কথা—
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো তাও ত শুনেছ সব,
শিব-সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায়
সদাই কলকল রব।

তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না আমার সয় না
আমার হয় না সহ্য তা।
আমি ভাবি কোথা যাব কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি ব'সে বিল্ববৃক্ষমূলে॥

হিমালয় আর কৈলাস শিখর
নহে দূর যাতায়াতে,
মনে হ'লে মা দিনে শতবার
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে,
বাৎসল্যভাবেতে তাচ্ছল্য কিসে শুনি কহ মা।
আমি হতেম তোমার মা জানাইতাম মা
মায়ের কত স্নেহ মা।

তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয়,
হোক মা ও হোক মা।
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয়,
আমি এ সুখ-শরদে মরি মনের খেদে,
কথায় কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে॥ *

প্রথম গানে সতীকে আনিবার জন্য মেনকা হিমালয়কে কৈলাসে পাঠাইয়াছেন, দ্বিতীয় গানে সতী আপনা হইতেই বাপের বাড়ী আসিয়া মেনকার নিকট অভিমান করিতেছেন। এ দুই-ই সত্য। যাহা সত্য, বাঙ্গলার প্রাচীন কবিগণ তাহাকেই নানা বৈচিত্র্যে কাব্যের রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইহা শুধু বাঙ্গলার গৃহস্থালীর এক অঙ্গ নয়, ইহা শুধু বাঙ্গলার সমাজের এক অংশের চিত্রও নয়। আমরা যাহাকে বলি **বাঙ্গলার প্রাণ,** ইহা তাহাই। যে প্রাণ হইতে বাঙ্গলার সমাজ, বাঙ্গলার গৃহধর্ম্ম, বাঙ্গলার দেবদেবী, বাঙ্গলার সাহিত্য,—সেই প্রাণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অংশে অংশে পৃথক্ করিয়া দেখান যায় না। সেই বাঙ্গলার প্রাণ এক,—অথচ তার অনন্তকালে অনন্ত বিকাশ। মেনকা ও সতীর বাৎসল্যে, শিব ও দুর্গার দাম্পত্যে,—গৃহধর্ম্মে, সমাজে ও সাহিত্যে বাঙ্গলার প্রাণের যে বিকাশ দেখিতেছি, বাঙ্গালী যেন সেই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। বাঙ্গলায় জঠরাগ্নি প্রধূমিত, প্রজ্বলিত হইয়া এক বিরাট্ শ্মশান রচনা করিয়াছে। অথচ তাহারি মধ্যে বাঙ্গালীর ঘরে জগজ্জননী আসিতেছেন। এই সন্ধিপূজার মহাসন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী সমস্বরে বল,—নমস্তস্যৈ।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

---

* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—পৃঃ ১৫৬৬—৬৭।

বেণের মেয়ে

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ষোড়শ অধ্যায়

১

সমস্ত নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া গেলে ছেলের কথা মায়ার মনে পড়িল। সে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল, দেখিল, বিছানার উপর ছেলে খেলা করিতেছে। ৪।৫ জন চাকর-চাকরাণী তাহাকে খেলা দিতেছে। মায়া গিয়াই ছেলেটিকে কোলে করিল ও মুখে চুমা খাইল; বলিল, "আমি তোমার কে বল দেখি?" সে বলিল, "নূতন মা।" "তোমার নূতন বাবা দেখিবে?" ছেলে বলিল, "নূতন মা, নূতন বাবা, দেখিব বই কি—কই?" মায়া বলিল, "চল দেখাই গে।" ছেলে কোলে করিয়া সে একলা গঙ্গার ধারেই যে এক সারি ঘর আছে, সেই দিকে গেল। একটা ঘরে ঢুকিয়া সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর এক ঘরে গেল। গঙ্গার ধারের বড় জানালা খুলিয়া দিল, আলো আসিলে জীবন ধনীর পিশাচখণ্ডের সেই প্রতিমাখানি দেখা গেল। সে প্রতিমা এখনও ঠিক তেমনি আছে। কেন না, পিশাচখণ্ডের একজন কুমার আসিয়া প্রতি সপ্তাহে রং চটিলে রং দিয়া যায়, মাটী চটিলে মাটী দিয়া যায়।

প্রতিমার সম্মুখে মায়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল, ছেলেকেও বলিল—"নম কর।" ছেলেও মাটীতে মাথা ছোঁয়াইয়া নমস্কার করিল। সে ঘরে ধূপ ধনা, ফুল-চন্দন, দুর্ব্বা, আলো চাউল, অগুরু গুগ্‌গুল সর্ব্বদা তৈয়ারি থাকে। মায়া ফুল-চন্দন, ধূপ-ধূনা দিয়া প্রতিমা পূজা করিল, খানিক কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল, তার পর হাত যোড় করিয়া বলিল—"তোমারই হুকুমে তোমারই নাম ও গোত্ররক্ষার জন্য তোমারই জ্ঞাতি সাধন ধনীর এই ছেলেকে আমি পোষ্যপুত্র লইয়াছি। এখন ইহার মঙ্গলামঙ্গল তুমি দেখিবে। ইহাকে তোমারই হাতে অর্পণ করিলাম।" মায়া স্তম্ভিত হইয়া শুনিল, কে যেন বলিল,—"পমায়ু বাড়ুক।" প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া দেখিল, প্রতিমার ঠোঁট দুটি যেন নড়িতেছে।

স্বামীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া মায়ার মহা আহ্লাদ হইল। সে ছেলেকে আবার বলিল, "নম কর।" ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কে?" "তোমার নূতন বাবা।" ছেলে বলিল, "পুতুল বাবা, মাটীর বাবা।" মায়া ছেলে কোলে করিয়া আর একটি ঘর খুলিল

ও গঙ্গার দিকে যে জানালা ছিল, তাহা খুলিয়া দিল। সে ঘরে জীবন ধনীর সাঁজোয়া, পাগ্‌ড়ি, আঙরাখা, তীর, ধনুক, তূণ, জুতা, কাপড় সব সাজান ছিল। মায়া প্রত্যেকটির কাছে গিয়া নমস্কার করিল ও ছেলেটিকে 'নম' করাইল—বলিল, "এ সব তোমার নূতন বাবার।" ছেলে বলিল, "মাটীর বাবার—পুতুল বাবার।"

ছেলে কোলে করিয়া মায়া দূরে একটি উঠানে গিয়া পড়িল—সে ত উঠান নয়, একটি কারখানা। কামার ও সেকরাদের অনেক যন্ত্রপাতি ছড়ান রহিয়াছে, পাশে একটা বারান্দায় অষ্টধাতুর একটি প্রতিমা তৈয়ার রহিয়াছে। মায়া সে প্রতিমার সম্মুখে গড় করিল, ছেলেকেও 'নম' করিতে বলিল। ছেলে নমস্কার করিয়া বলিল, "এ কি বাবা?" মায়া হাসিয়া বলিল, "এ অষ্ট ধাতুর বাবা।" ছেলে বলিয়া উঠিল, "অট্ট ধাতুর বাবা।" মায়ার সব সাধের সামগ্রীগুলি ছেলেকে দেখাইল, ছেলের মঙ্গলামঙ্গল স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিল। তাহার পর ছেলে কোলে করিয়া যেমন বাহিরে আসিল, ছেলে বলিয়া উঠিল, "মা, ক্ষিধে পেয়েছে।" মায়ার চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "তাই ত, ছেলেটা দানের পর অবধি এখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই।" আরও চমক ভাঙ্গিল যে, নিজেরও আজ সমস্ত দিন এক বিন্দু জলও পেটে পড়ে নাই। সুতরাং তাহাকে খাবারের চেষ্টায় যাইতে হইল। ছেলেকে একটু দুধ ও মিষ্ট খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে শাঁখ বাজিল। সন্ধ্যা হইয়াছে, আর খাওয়া হইল না।

সপ্তদশ অধ্যায়

১

পিশাচখণ্ডী ভবদেব ভট্টকে বলিলেন, "রাজা বিহারী ও তাঁহার মেয়ে দুই জনেরই ত পোষ্যপুত্র লওয়া হইয়া গেল। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, অনেকগুলি লোক আসিয়াছেন, অনেক কলাবৎ আসিয়াছেন, অনেক শিল্পী আসিয়াছেন, ইহাঁদের সকলকেই আসচে বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাজসভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সকলেই আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সকলেই আসিবেন। আপনি উহাঁদের কিছু উপদেশ দিয়া দিন। রাজসভায় কিরূপ জিনিস আনা উচিত, আর কিরূপ জিনিস আনা উচিত নয়, কিরূপ জিনিসের পারিতোষিক দেওয়া উচিত আর কিরূপ জিনিসের ধিক্কার হওয়া উচিত—তাহা আপনি বুঝাইয়া দিন। আমি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বারেন্দ্র, কামরূপ, শ্রীহট্ট, সমতট, বঙ্গ—এমন কি, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ নিমন্ত্রণ করিয়া অঙ্গ-রাজ্য, চম্পানগরও নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার

আরও কিছু দূর উত্তরে বিক্রমশিলা বিহারে যাইয়া দেখি, সেখানকার পণ্ডিতেরা কালচক্রের আলোচনা করিতেছেন। এ কালচক্র তন্ত্র নহে—জ্যে আমি তাঁহাদের গণনায় জানিলাম, অক্ষয়তৃতীয়ার আর পাঁচ দিন আছে। সুতরাং মায়ার পোষ্যপুত্রগ্রহণে আমাকে ত থাকিতে হইবে, আমি একখানি ছিপ ভাড়া করিলাম। আমি [illegible] দিনের মধ্যে সাতগাঁয় আসিলাম, আসিয়া দেখিলাম, এই এক মহা সুযোগ। [illegible]পনিও উপস্থিত আছেন। বাঙ্গলার সবগুলি লোক এখানে উপস্থিত আছেন। এখন যদি পাকা মাঝী স[illegible]য়া ইহাদিগকে ঠিক পথে চালাইয়া দিতে পারেন, রাজসভায় আপনারই কার্য্যের ল[illegible] হইবে। অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে, অনেক বাজে কাজ করিতে হইবে না।"

ভবদেব ভট্ট বলিলেন—"বেশ ত। কথাটা তুমি ভালই বলিয়াছ, বিদায়ের দিনে সকলে ত একত্র হইবেন, সেই দিন যাহা হয় করা যাইবে।"

২

তিন চার দিন পরে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। রাজা ও সেনাপতি আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, কারবারী বেণেরাও অনেকেই চলিয়া গিয়াছিল; বিষয়ী লোকও প্রায়ই চলিয়া গিয়াছিল; ছিলেন কেবল পণ্ডিত, কলাবৎ, কারিকর, শিল্পী ও অন্য-অন্য গুণিজন। পিশাচখণ্ডীও ইহাঁদেরই চান। বিদায়ের দিন আহারান্তে সকলে উপস্থিত হইলে ভবদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা বোধ হয়, ভবতারণ পিশাচখণ্ডী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়া থাকিবেন, পরম ভট্টারক —পরমেশ্বর—মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই সাতগাঁয়ের চড়ায় রাজসভা করিয়া কাব্যশাস্ত্র, কলা, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই গুণিগণের সমাদর করিবেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবেন, দুঃস্থ গুণিগণের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এজন্য মহারাজ যে সমস্ত সাতগাঁয়েরই এক বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিবেন, এমন নহে, তাঁহার বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্যের একবৎসরের রাজস্বই এই কার্য্যে ব্যয় করিবেন; তাহাতেও যদি সঙ্কুলান না হয়, তবে তাঁহার বহুকাল-সঞ্চিত রত্নরাশিতেও হস্তক্ষেপ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে হিন্দু সম্রাট্‌গণ পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ রাজসভা করিতেন এবং গুণিজনের পুরস্কার দিতে দিতে আপন শিরস্ত্রাণ, এমন কি, অঙ্গের মহার্ঘ পরিচ্ছদ পর্য্যন্তও দান করিয়া একবস্ত্রে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের অদেয় থাকিত কেবল দুইটি জিনিস—রাজচিহ্ন ও যুদ্ধের উপকরণ। মহারাজ স্বয়ং তাঁহার অনুচরবর্গ ও তাঁহার সদস্যবর্গ আমরা সকলে প্রাণপণ যত্নে, যাহাতে

এই ব্যাপার মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিব। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এরূপ মহাসভা কোথাও দেখি নাই। আমাদিগকে পুরাণ কাগজপত্র ও পুস্তকাদি দেখিয়া কার্য্যপ্রণালী অবধারণ করিতে হইবে। তাহাতে যদি কোন ত্রুটি হয়, আপনারা নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

গুণিজনের এই পুরস্কার-ব্যাপারে আমরা সম্প্রদায় বাছিব না, বংশ দেখিব না, জাতি দেখিব না;—দেখিব কেবলী কে কেমন কবি, কে কেমন শিল্পী, কে কেমন শাস্ত্রজ্ঞ, কে কেমন কলাবৎ। আমরা ভাষার বিচার করিব না; সংস্কৃত, বাঙ্গলা, মাগধী, শৌরসেনী যে কোন ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করিব। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদেরও এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। আপনারা সকলেই গুণিজন,—গুণহীন,অসার, অপদার্থ কিছুই আমাদের সম্মুখে আনিবেন না। যাহা কিছু আনিবেন, তাহার প্রথম পরীক্ষা আপনাদেরই কাছে। আপনারা ভাল জিনিস না হইলে, কিছুতেই আনিবেন না। কেন না, এরূপ মহাসভায় পুরস্কৃত হইলে আপনাদের যশ যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিশ্রুত হইবে তেমন তিরস্কৃত হইলে আপনাদের অপযশের আর সীমা থাকিবে না। গুণিজনের পুরস্কার করিতে আমাদের হৃদয় যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনই তিরস্কার করিতে হইলেও আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব আপনারা বিধিমতে চেষ্টা করিবেন, যেন তিরস্কারের মত কিছু মহাসভায় উপস্থিত না হয়।

৩

আরও কয়েকটি কথা আপনাদিগকে আমি বলিয়া দিব। এমন যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন—যিনি কত গুণিজনকে কত লক্ষ লক্ষ দান করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারও কলঙ্ক আছে। তিনি আপনার সমক্ষে আপনার স্তুতিবাদ না শুনিয়া দান করিতেন না। শ্রীহর্ষেরও সে কলঙ্ক আছে। আমাদের মহারাজ, সম্মুখে আত্মস্তুতি, বিষবৎ পরিহার করিয়া থাকেন। আপনারা কেহ তাঁহাকে অশোক, বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করিবেন না; তাঁহাকে সরস্বতীর বা বৃহস্পতির অবতার বলিয়া সরস্বতীর ও বৃহস্পতির অবমাননা করিবেন না। আপনারা নাটক লিখিয়া তাঁহার যশোগান করিবেন না বা তাঁহার নামে কাব্য-নাটকাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি একজন খাঁটি মানুষ, তিনি চান খাঁটি জিনিস—ভেজাল দেখিতে পারেন না। আপনারা ভেজাল জিনিস চালাইবার চেষ্টা করিবেন না। গুণের আদর ভিন্ন এত ব্যয়ে এত সমারোহে তাঁহার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। আপনারা মনে করিবেন না, তিনি তোষামোদে তুষ্ট হইয়া কাহাকেও

পুরস্কার করিবেন। পরম শত্রুরও গুণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে আদর করিবেন। সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস। সনাতন ধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠানই তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষাও আর এক উচ্চতর রাজধর্ম্ম আছে—তাহার নাম গুণের আদর। একটা নির্গুণ পুরুষকে গুণের আদর দিলে তাহার দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হয়, শত শত চোর ডাকাতেও দেশের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। নির্গুণকে গুণীর আদর দেওয়া তিনি পঞ্চমহাপাতকেরও উপর মহাপাতক বলিয়া মনে করেন। এক জন নির্গুণ পুরুষকে গুণীর পদে বসাইলে, সে যত দিন বাঁচিবে, সমস্ত গুণিজনের অবমান করিবে। দেশ হইতে একটা গুণই হয় ত লোপ হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেও তিনি বৌদ্ধ ও জৈন কবির যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ চিত্রকর, বৌদ্ধ সূত্রধার, বৌদ্ধ স্বর্ণকার তাঁহার বড় আদরের পাত্র। জ্যোতিষীরা ত শাকদ্বীপী। কিন্তু মহারাজ তাহাদের কতই না আদর করিয়া থাকেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন ত বৌদ্ধ-মঠে ও জৈন উপাশ্রয়েই আশ্রয় পাইয়াছে। তথাপি সেখানেও একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে, মহারাজের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না।

সুতরাং আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, পবিত্র গুণরাশি লইয়া আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সভারোহণ করিবেন।”

৪

ভবদেবের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই ‘সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন। দুই এক জন আবার ভবদেবেরই ভাষ্যভূত দুই একটি বক্তৃতাও করিলেন। পিশাচখণ্ডী বারংবার বলিতে লাগিলেন—‘আপনারা বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিবেন।’ হঠাৎ গুরুপুত্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন—বলিলেন,—“মস্করী মহাশয় ভারতবর্ষে যাবতীয় বৌদ্ধ গুণিগণকে এই সভায় একত্র করিবার ভার আমার উপর দিয়াছেন; আমিও আনন্দের সহিত সে ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং কয়েক মাস ধরিয়া এই চেষ্টাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি; বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরাই দেশভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা দেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। একজন জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কবি ছয় ভাষায় সমান কবিতা লিখিতে না পারে, সে কবিই নহে। মহামহোপাধ্যায় ভবদেবভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদ্যশাস্ত্র বৌদ্ধমঠ ও জৈন উপাশ্রয়কেই আশ্রয় করিয়াছে; শুধু বৈদ্য-

শাস্ত্র কেন ? সমস্ত ও কলা আজিও বৌদ্ধগণের করায়ত্ত। কার্পাস-বস্ত্রই বলুন, ক্ষৌমবস্ত্রই বলুন, পত্রোর্ণাই বলুন, চিত্রকার্য্যই বলুন, ভাস্করকার্য্যই বলুন, শিলালিপিই বলুন, দেবপ্রতিমাই বলুন, মনুষ্যপ্রতিমাই বলুন, গীতবাদিত্রই বলুন, সবই এখন বৌদ্ধদের হাতে। ইহাঁরা যাহাতে আপন আপন উত্তম উত্তম শিল্প-কার্য্য রাজসভায় উপস্থিত করিতে পারেন, আমি তাহার চেষ্টা করিব। আমি নিজে রাজসভায় উপস্থিত থাকিব, পরীক্ষা দিব ; প্রয়োজন হইলে রাজার আদেশে পরীক্ষকের আসনও গ্রহণ করিব। শুনিয়াছি, অনেক কুলবালা পরীক্ষা দিতে আসিবেন। আমিও বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আনাইবার চেষ্টা করিব। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা আপন আপন ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়া কবিতা লিখিবেন। মহারাজাধিরাজ যেন বিধর্ম্মীর মত বলিয়া সেগুলি উপেক্ষা না করেন। আহা, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করা এই সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহার আনন্দ আর ধরিত না। তিনি :কলিযুগপাবনাবতার মহারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি যেমন বিদুষী ও পণ্ডিতা, তেমনই কবি ও সাধিকা। তিনি অল্প দিন হইল দেহ রা ছেন ; কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যার ভিতরে অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছে আমি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি উৎকণ্ঠিত-চি ফাল্গুনী পূর্ণিমার অপেক্ষা করিব ও সাধ্যমত মহাসভার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব।"

গুরুপুত্রের বক্তৃতায় সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল।

৫

রাজা বিহারী দত্তের কর্ম্মচারীরা প্রচুর অর্থ লইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা ভব-তারণ পিশাচখণ্ডীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে বসাইল এবং তাঁহারই হাত দিয়া গুণিজনের পাথেয় ও বিদায় দিতে লাগিল। পাথেয়ের হিসাব করিতে এই কর্ম্মচারীরা দক্ষ বৃহ-স্পতি। কারণ, তাহারা যাবজ্জীবন ধরিয়া বেণেদের ঠকাইয়া বিস্তর পাথেয় লইয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য আর ভবদেবকে বকাবকি করিতে হইল না। কিন্তু বিদায় লইয়া অনেকে অনেক রকম গোল বাধাইল। কিন্তু পিশাচখণ্ডী হাত একটু দরাজ করিয়া দিয়া সব গোল থামাইয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্যে, সদালাপে ও মিষ্টকথায় বাঙ্গলা শুদ্ধ লোক যেন বশ হইয়া গেল। বৌদ্ধেরা কেহ কোনরূপ গোল তুলিলে গুরুপুত্র তখনই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন,—'গোল করিও না।' বিদায় লইয়া সকলে 'জয়োঽস্তু' 'কল্যাণমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সাতগাঁ আবার ৭।৮ মাসের জন্য যে ভোঁ ভোঁ সেই ভোঁ ভোঁ হইয়া রহিল।

গুরুপুত্র ইতিমধ্যে অনেক কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া ইন্দ্র-ভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা দেবীর দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া জন কয়েক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অনেক অন্বেষণের পর দক্ষিণরাঢ়ের এক কোণে এক নিভৃত স্থানে নাঢ়পণ্ডিতের খোঁজ পাইলেন। নাঢ়ী আবার সেখান হইতে দশ ক্রোশ তফাতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে বার বার লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সদলবলে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আপনার গুরুর, কিন্তু, তিনি কোথাও খোঁজ পাইলেন না। শেষ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এক মহাবিহার হইতে খবর পাইলেন যে, তিনি বহুসংখ্যক কীর্ত্তনীয়া লইয়া ভোটদেশে গিয়াছেন। তিনি আরও খবর পাই-লেন যে, গুরুদেব শীতের পূর্ব্বেই নেপাল আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তথাকার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নেপালে ললিতপত্তনে লোক বসাইয়া রাখিলেন—গুরুদেব যেন শিবচতুর্দ্দশীর পরই যাত্রা করিয়া সাতগাঁ চলিয়া আসেন।

ভাস্করকার্য্যে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। সে খ্যাতি বজায় থাকে, গুরুপুত্রের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। যেখানে যে পাথরের ভাল মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তা বৌদ্ধদেরই হউক বা হিন্দুদেরই হউক, আনাইয়া রাখিলেন। সোনার গহনা বৌদ্ধবিহারেই ভাল হইত। বিহারের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলেই বিহারের সেকরার হাতে সোনা দিত। কি নকাসির কাজে, কি পালিসে, কি হীরা কাটায়, কি ক্ষোদকারীতে বিহারের সেকরারা সিদ্ধ-হস্ত ছিল। অনেক ভাল ভাল গহনা গুরুপুত্রের খাতিরে তাহারা তৈয়ারি করিয়া রাজসভায় উপ-স্থিত করিবার জন্য তাঁহারই কাছে রাজসভায় রাখিয়া গেল। কাঠের উপর নক্সাও বৌদ্ধেরা খুব করিত। ভাল ভাল নক্সা করা কাঠের জিনিস মহাবিহারে আসিতে লাগিল।

কিন্তু গুরুপুত্রের ঝোঁক—তিনি কাব্য লিখিয়া পুরস্কার পাইবেন। তিনি সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত। বহুসংখ্যক প্রাকৃতভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের দিকে তাঁহার ঝোঁক নাই; তাঁহার ঝোঁক বাঙ্গলার দিকে। অল্পের মধ্যে একটি বা দুইটি পদে রস ফুটান তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। যখনই সময় পাইতেন, চক্ষু উপরে তুলিয়া কলম হাতে লইয়া কি ভাবিতেন। দুই মাস তাঁহার ভাবিতেই গেল, তাহার পর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখেন আর ছিঁড়িয়া ফেলেন। কত তালপাতাই যে তিনি ছিঁড়িলেন, তাহার ঠিকানা নাই; তথাপি তাঁহার মনের মত কবিতা হইল না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। বিক্রমশীল পর্য্যন্ত তিনি ত পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন, এবার সেখান হইতে আরও পশ্চিমে চলিলেন। বিক্রমশীল হইতে কয়েক ক্রোশ গিয়াই গঙ্গাতীরে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের), অঙ্গ ও মগধের সীমা। গঙ্গার ধার হইতেই পাহাড় উঠিয়া অনেক দূর মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দুর্গ, চারিদিকে মুর্চ্চা বাঁধা। নিকটেই কষ্টহারিণীর ঘাট। সেখান হইতে কিছু দূরে সীতাকুণ্ড। মস্করী সকল জায়গায় তীর্থের কাজ করিলেন, দুর্গাধিপতির সহিত দেখা করিলেন, শিল্পীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, আবার পশ্চিমদিকে নৌকা করিয়া চলিলেন।

এখন যেখানে বক্তিয়ারপুর হইয়াছে, সেইখানকার ঘাটে নৌকা লাগিল। মাঝীদিগকে পাটনা গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া মস্করী জনকয়েকমাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিলেন। এইখানটাই মগধের প্রধান জায়গা—বড় বড় মাঠ, বড় বড় গ্রাম. বড় বড় গোচর—প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই-দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিঁড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া-ক্ষীর, প্রচুর খাজা। মস্করী সন্ধ্যার পরই কোন গোয়ালের গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খান। তাঁহার সঙ্গীরা বাজারে মিষ্টান্ন খাইয়া ও চিঁড়া-মুড়কির ফলার করিয়া দিন কাটান। এইখানে বলিয়া রাখি, এই বৌদ্ধপ্লাবিত দেশে ভাল ব্রাহ্মণ একেবারেই পাওয়া যাইত না। জ্যোতিষব্যবসায়ী ঘরকতক আচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিল। তাহাদের আচার-ব্যবহার বৌদ্ধদের চেয়ে কোনমতেই ভাল নয়। ভুঁইহার জাতির এখনও বোলবোলা হয় নাই। কিন্তু জাতিটা গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা বিহারের জমী ছাপাইয়া খাইতেছে, তাই উহাদের নাম হইয়াছে ভুঁইহার বা ভুমিহারক। উহারা এখনও বৌদ্ধই আছে, কিন্তু 'বাভন' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মস্করী তাহাদের বাড়ীতে অতিথি হইতে রাজী নন।

মস্করীর পা খুব চলে। তিনি সকালে বার ক্রোশ গিয়া কোথাও আড্ডা লয়েন, বৈকালেও ৫।৬ ক্রোশ হাঁটেন। দুই দিনের পর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটা কি যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তিনি সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিলেন— "বল দেখি ওটা কি ?" কেহ বলিল স্তূপ, কেহ বলিল মন্দিরের চূড়া। একজন বলিল, "না। ওটা গোপুর। দেখিতেছেন না, উহার মাথায় দুইটা চূড়া ? মন্দির বা স্তূপ হইলে এরূপ হইত না। বোধ হয়, ও দু'টা কোটে দুয়ার। পথের লোককে জিজ্ঞাসা

করিয়া জানিলেন যে, মগধের রাজধানী ওদন্তপুরী অতি নিকট। ও দু'টা ওদন্তপুরী বিহারের একদিকের দরজা। মস্করী আগেভাগেই ওদন্তপুরীর রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন।

দূত গিয়া অল্প চেষ্টাতেই রাজার দর্শন পাইল। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রীতিমত শিষ্টাচারের পর বলিল—বঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব আগামী ফাল্‌গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিয়া কাব্যে, শাস্ত্রে ও শিল্পে গুণিজনের পুরস্কার করিবেন—এইজন্য তিনি রাঢ়দেশের ব্রাহ্মণ ভবতারণ পিশাচখণ্ডীকে আপনাদের দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ, আপনার দেশের সকল গুণিজন নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পিশাচখণ্ডীকে সাহায্য করুন, যেন একটিও বাদ না যায়—ইহাই তাঁহার একান্ত অনুরোধ।"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিশাচখণ্ডী মহাশয় কোথায়?"

"তিনি নিকটেই আছেন।"

রাজা তাঁহার পাত্রমিত্রগণের একজন প্রধান পুরুষকে বলিলেন—"তুমি গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।"

২

পিশাচখণ্ডী উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার সহিত সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পিশাচখণ্ডীও তাঁহাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও রাজা তাঁহাকে যে আসন দেখাইয়া দিলেন, সেই আসনে বসিলেন। তিনি কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজা বলিলেন :—

"বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেব যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা অতিসাধু। তিনি যে দেশভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বিচার না করিয়াই গুণিজনের পুরস্কার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা আরও সাধু। মগধ এককালে গুণিজনের খনি ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু এখন মগধের সে দিন গিয়াছে। শ্রীশ্রী ৫ শ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপ মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়। এখানে যাহা কিছু আছে, আপনি অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারেন। এখানে বিহারে বিহারে এখনও কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাওয়া যায়। এখনও এখানে পাথরের কাজ খুব ভাল হয়, সোনারূপার কাজ খুব ভাল হয়, মিষ্টান্নও খুব ভাল হয়। যত রকম শিল্পী আপনার ইচ্ছা হয়, লইয়া যাইতে পারেন। এমন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহারা যদি পরীক্ষা দিয়া পারিতোষিক পায়, তবে ত সে আমারই গৌরব, আমার রাজ্যেরই

গৌরব।" তাহার পর পাত্রমিত্রবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলেই যথাসাধ্য পিশাচখণ্ডীর সাহায্য করুন।"

রাজার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পিশাচখণ্ডী অনেকক্ষণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন; এবং সময় সংক্ষেপ, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যটি সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য রাজাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা, পিশাচখণ্ডী যে কয়দিন ওদন্তপুরীতে থাকিবেন, ততদিনের জন্য তাঁহার থাকার ও চাকরবাকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি মগধ-দেশের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, তাঁহার যান-বাহনের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন—কথা হইল, পিশাচখণ্ডীকে পাটনার ঘাটে উঠাইয়া দিয়া যান-বাহন ফিরিয়া আসিবে। সেইদিনই পিশাচখণ্ডী রাজার প্রধান পাত্র বুদ্ধরক্ষিতের সহিত ওদন্তপুরী দেখিতে গেলেন।

নগরে সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন কষ্টিপাথরের থাম; থামে কতরকম মালা, কত-রকম হার, কতরকম গহনা ঝুলিতেছে; থামের মাথায় প্রায়ই পদ্ম, কোনটি কুঁড়ী, কোনটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন স্থানে থামটিই মানুষের মূর্ত্তি, মাথায় বালক। নানান স্থানে কষ্টিপাথরের নানান মূর্ত্তি—বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, কত কত দেবদেবীর মূর্ত্তি। ক্রমে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে গেলেন। এই বিহারের দুয়ারই তিনি বহু-ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুয়ারটি আছে বটে, কিন্তু কখনও বন্ধ হয় না।

ভিতরে গিয়া দেখেন, দুইতলায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর থাকিবার স্থান; জায়গায় জায়গায় ভাণ্ডার, বহুতর খাবার জিনিস প্রচুরপরিমাণে সংগ্রহ রহিয়াছে; কোন কোন জায়গায় বা যাত্রার সব সরঞ্জাম, কত কত আশা, কত কত সোঁটা, কত কত নিশান, কত কত খুন্তী, কত কত অর্দ্ধচন্দ্র, রূপার সোনার রাশি রাশি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি—কাহারও হীরার চোখ, কাহারও পান্নার চোখ, কাহারও নীলার চোখ। যে সময়ে কথা হইতেছে, মহম্মদিয়া বক্তিয়ার তাহার ২০০ শত বৎসর পরে এই বিহারই লুঠ করিয়া এত সোনা-রূপা-হীরার বৌদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন যে, সেগুলি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য সত্তরটি অশ্বতর লাগিয়াছিল। এই বিহারের ভাণ্ডারে রাশি রাশি তালপাতার পুথি ছিল, সিন্দুকভরা কারচুপিকরা রেসমের কাপড় ছিল, শত শত চামর ছিল, আর ধূপদান দীপদান যে কতরকমের কত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া উঠা যায় না। মন্ত্রী সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, যাহা যাহা বাজলায় পাঠাইবার, সমস্ত চিহ্ন করিয়া দিলেন—রাজপাত্র স্বীকার করিলেন, সেগুলি যথাসময়ে সাতগাঁয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

ওদন্তপুরীর বাজারে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী দেখিলেন, নানারূপ মিষ্টান্নের

দোকান। এখানকার লোক প্রায়ই সব বৌদ্ধ। তাহাদের বাজারের জিনিস খাইতে আপত্তি নাই। অনেকে তাই খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুতরাং বিচিত্র বিচিত্র খাবারের জিনিস তৈয়ারি হইতেছে। খাবারের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাজা, আর সিলাবের চিঁড়া—যেমন ছোট, তেমনি মিষ্ট, আর তেমনি সুগন্ধ। দুধের জিনিস কি এত পাওয়া যায়—দই, দুধ, ক্ষীর, ননী, মাখন, খোয়া—বোধ হয়, দ্বাপরের বৃন্দাবনটি যেন এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। ওদন্তপুরীতে দিন কয়েক থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহাকে পরদিন প্রত্যূষেই চলিয়া যাইতে হইল—কেননা, সময় সংক্ষেপ, কাজ বেশী।

৩

তিনি নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ রক্ষিত। সে বলিল, "বুদ্ধদেবের প্রথম ও প্রধান ব্রাহ্মণ শিষ্য সারীপুত্রের জন্মস্থান নালন্দায়। তাঁহার মা সারী জমীদারের মেয়ে। সারীপুত্র পীড়িত হইয়া মায়ের কোলে আসিয়াই মরিলেন। মাও আপনার সমস্ত সম্পত্তি সঙ্ঘে দিয়া যান। সেই সম্পত্তি হইতেই নালন্দাবিহারের উৎপত্তি ও উন্নতি। ৫০০।৬০০ বৎসর হইতে এখানে পণ্ডিতের কিছু বেশী সমাগম হইতেছে। গুপ্তরাজেরা এখানে বড় বড় বিহার দিয়া গিয়াছেন। চলুন, দেখিবেন, এখন তাহাদের আর সে শ্রী নাই। মহারাজ যে বলিয়াছেন, তিনি মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়াছেন, কথাটা ঠিক।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে দূরে একটি বটগাছ দেখা গেল। বুদ্ধরক্ষিত বলিলেন, "ঐ বটগ্রাম। ওখানে সূর্য্যের একটি কুণ্ড আছে, সূর্য্যের একটি প্রতিমা আছে, তাঁহার পূজা হয়, কয়েকঘর ব্রাহ্মণও আছেন। চলুন, তাঁহাদের বাটীতে বিশ্রাম করিয়া আপনি নালন্দায় যাইবেন। নালন্দার যদিও এখন সে গৌরব নাই, তবু আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন—কত বড় বড় বাড়ী, কত বড় বড় বিহার, কত বড় বড় স্তূপ, কত ভাল ভাল মূর্ত্তি, কত কত পণ্ডিত, কত কত ছাত্র; আর দেখিবেন রাশি রাশি পুথি।"

নালন্দায় একটি বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার একধারে বড় বড় বিহার—একটার পর একটা, তার পর একটা, তার পর একটা, দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—আর একধারে কেবল স্তূপ; বড়টা ২০০।২৫০ ফুট উঁচা, আর মাঝারি, ছোট যে কত আছে, ঠিকানা নাই। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের হীনাবস্থা—বাড় বা স্তূপ ভাঙ্গিলে আর মেরামত হয় না। কিন্তু এখনও লোকের ধর্ম্মের উপর এত

দূর শ্রদ্ধা যে, জায়গাটি তাহারা কিরূপ পরিষ্কার রাখিয়াছে—সর্ব্বদাই ঝর্‌-ঝর্‌-তর্‌-তর করে। বিহারগুলি ও স্তূপগুলির ওপাশে পড়ুয়াদিগের কুটী—একটি একটি কুটী পঁচিশের বদ্ধ ঘর—সাম্‌নে দাওয়া। ইহারই মধ্যে পড়ুয়ার খাইবার, থাকিবার, বসিবার ও পড়িবার জায়গা। সবই তাহাকে নিজ হাতে করিতে হয়। মাঝে মাঝে বড বড় আটচালা—সেইখানে বসিয়া তাহারা পরস্পর আলাপ করে, শাস্ত্রচর্চ্চা করে, তর্ক-বিতর্ক করে, পড়া লয়, পড়া দেয়। কোন বিদেশী পণ্ডিত আসিলে তাহাকে এইখানেই সংবর্দ্ধনা করে। মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা, বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান। তাহারও উঠানে আটচালা—গল্প-গুজব-আমোদ-প্রমোদের জায়গা। নালন্দার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রকাণ্ড এক উঠানের মাঝখানে এইরূপ এক আটচালায় বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে শান্তিদেব মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে শান্তিধামে চলিয়া যান।

তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত পিশাচথণ্ডীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন :—

"আপনি যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ ভার লইলাম। যথাসময়ে আমাদের লোকজন আপন .দর ওখানে পৌঁছিবে। আপনার যদি সময় থাকে, আমার অনুরোধ, একবার নালন ।া বিশেষ করিয়া দেখিয়া যান।"

পিশাচথণ্ডীও বুদ্ধপা ি.তকে বলিলেন, "আপনি, আমাকে নালন্দায় দেখিবার যাহা কিছু আছে, সব দেখান।"

রীতিমত শিষ্টাচারের পর চৌতালা হইতে নামিয়া উভয়ে নালন্দানগরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নালন্দা দেখিয়া পরদিন প্রত্যূষে উভয়ে সিলাও যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

৪

রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধরক্ষিত সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

"এই যে চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটু সমান জমি দেখিতেছেন—এই রাজগৃহ। ইহার আর এক নাম গিরিব্রজ। এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান পৃথিবীতে দুর্ল্ভ। ইহাই জরাসন্ধের রাজধানী। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, এই গিরিব্রজের তোরণদ্বার।"

"তোরণের ভিতর দিয়া নদী আসিতেছে!"

"না আসিলে এই সমতল ভূমির জল কোথা দিয়া বাহির হইবে? আর কোন দিকেই ত পথ নাই। ঐ ক্ষুদ্র নদীটি সরস্বতী। কিন্তু উহার জলে হাত দিয়া দেখুন, উহা বেশ গরম। তোরণের দুইধারে অনেকগুলি গরম জলের ফোয়ারা আছে। সরস্বতী ঐ গরম জলের সহিত মিশিয়া ক্রমে চওড়া হইতেছে। উচ্চে তোরণের দুই ধারে ঐ

দেখুন, চৌকা করিয়া পাথরে বাঁধান দুইটি বসিবার জায়গা—উহার নাম 'জরাসন্ধকা বৈঠক।' বলে যে, জরাসন্ধ নাকি ঐখানে বসিয়া শত্রুদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চলুন—এই রাজগৃহের এক কোণে মনিয়ার নামে এক মাঠ আছে। সেখানে এক আশ্চর্য্য কূয়া আছে, উহার উপরে গম্বুজ বাঁধান। মঠে ভিক্ষুও অনেকগুলি আছে।"

সেখানে উপস্থিত হইয়া পিশাচখণ্ডী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন ধ্যানে মগ্ন যে, বাহিরের কোন সংবাদই রাখেন না। দুই জন লোক যে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, অনেক ডাকাডাকি করিল, তাঁহাদের উদ্বোধই হইল না।

সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রিয়ভূমি গৃধ্রকূটে গেলেন। অনেক দূর উঠিতে হইল। একে ত রাস্তা বড়ই চড়াই, তাহার উপর বেমেরামত—অনেক জায়গাই ধসিয়া গিয়াছে। প্রাণ হাতে করিয়া সেখানে যাইতে হয়। সেখানে গিয়াও দেখিলেন, একই ভাব। অনেকগুলি ভিক্ষু আছেন—সকলেই ধ্যানমগ্ন। ইঁহারা দিনের মধ্যে একবার উঠেন, কিন্তু কখন্—কেহই জানে না।

গিরিব্রজ ছাড়িয়া তাঁহারা দুই জনে নূতন রাজগৃহে আসিলেন। বেশ ডাগর সহর, এখন কিন্তু সবই ভাঙ্গা—সহরের প্রাচীর ভাঙ্গা, বাড়ীগুলা ভাঙ্গা, রাস্তায় যাতায়াত কঠিন। কেবল একটি বিহার আছে, তাহাও বৌদ্ধদের হাতে নয়। শৈব যোগীরা সেটি মেরামত করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা হঠযোগ করে, গুরু-পাদুকা পূজা করে, ভস্ম মাখে, জটা রাখে, গেরুয়া-কাপড় ও রুদ্রাক্ষ পরে, আর খুব গাঁজা খায়। তাঁহারা পিশাচখণ্ডীকে বলিয়া দিলেন, নাথযোগীদের কেহ কেহ সাতগাঁয়ের রাজসভায় যাইবেন।

সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে 'গিরি এক'—একটি পাহাড় প্রায় দুই হাজার ফুট উঠিয়াছে। তাহার উপরে বড় বড় ইটে তৈয়ারি একটা প্রকাণ্ড অশোকের স্তূপ, 'গিরি একে'র প্রায় মাথা হইতে একটা পথ দিয়া আর একটা পাহাড়ে যাওয়া যায়। সেখানে একটা বড় বিহার আছে। অতি প্রাচীন স্থবিরেরা এইখানে বাস করেন। তাঁহারা সংসারের কোন সম্পর্কই রাখেন না। 'গিরি এক' হইতে কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি বাড়ী এখন অত্যন্ত বেমেরামত—কিন্তু অনেক যাত্রী সেখানে যায়। এইখানে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার নাম পাবাপুরী।

মস্করী জৈনদের নামই শুনিয়াছিলেন, জীয়ন্ত জৈন কোন দিন দেখেন নাই। তিনি যাত্রীদের সহিত মিশিয়া গেলেন, বুদ্ধরক্ষিত তাহাতে চটিলেন ও একটু তফাতে থাকিতে লাগিলেন। মস্করী কিন্তু জৈনদের সাথে মিশিয়া—কোথায় কোন্ জৈন মঠ আছে, উপাশ্রয় আছে, কোথায় কোন্ পণ্ডিত বা কবি আছে—ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার অনেক কাজের খবর যোগাড় করিলেন। তিনি তাহাদের কথায় বুঝিতে

পারিলেন—মালব, গুজরাট, শাকম্ভরী, মরুদেশ, জঝৌটি, চেদি দেশ—এই সব জায়গায় জৈনদেরই প্রাচুর্য্যব বেশী ; বৌদ্ধ নাই বলিলেই হয়। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করি-লেন—"এই সব দেশ না ঘুরিয়া দেশে ফিরিব না।"

৫

যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি বাসায় বুদ্ধরক্ষিতের সঙ্গে মিলিলেন ও সেখান হইতে গয়াযাত্রা করিলেন। দুই দিনে গয়ায় পৌঁছিয়া দুই জনে মহাগোলে পড়িয়া গেলেন। বুদ্ধরক্ষিত গয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বোধগয়ায় যাইতে রাজী নহেন। পিশাচখণ্ডী বিষ্ণুপদ দেখিতে গেলেন একা। দেখিলেন, ফল্গু নদী হইতে গয়ার পাহাড়ে উঠিতে মাঝে একটি ছোটখাট মন্দির ও পাহাড়ের উপর কয়েকখানি সামান্য গোছের বাড়ী। বাড়ীগুলি গয়ালীদের। গয়ার মাহাত্ম্য এতদিন বেশী লোক জানিত না। এখন ক্রমে প্রচার হইতেছে, অনেক অনেক গয়া-মাহাত্ম্যের বই লেখা হইতেছে। গয়ায় অনেক যাত্রী আসিতেছে। গয়ালীদের প্রতাপ ও প্রভাব বাড়িতেছে। গয়া ছোট হইলেও দেখিলেই বোধ হয় উঠ্‌তি সহর। দণ্ডপাণি দত্ত উহার সামন্ত রাজা। সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর। এই সময়েরই কিছু দিন পরে সামন্ত বজ্রপাণি দত্ত একখানা শিলাপত্রে জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গয়াকে সামান্য গ্রাম দেখিয়াছিলাম, আমি উহাকে অমরাবতী করিয়া দিয়া গেলাম। সকল মহারাজাধিরাজ জয়পালের প্রতাপের ফল।" মস্করী সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, দুই জন গয়ালী পুরাণশাস্ত্রে বড়ই প্রবীণ. বিশেষ গয়ামাহাত্ম্যে তাঁহারা দক্ষ বৃহস্পতি। একজনের নাম মুরারি সেন, আর একজনের নাম শ্রীহর্ষ নাক-ফোঁফা। তাহারা বলিল, "আমরা তীর্থস্বামী। আমরা তীর্থ ছাড়িয়া কোথাও যাই না।" মস্করী গোলে পড়িলেন। তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি খুব প্রখর। তিনি বলিলেন, "এরূপ মহাসভায় গেলে ও আদর পাইলে আপনাদের তীর্থেরই ত গৌরব হইবে। তীর্থ-স্বামীর কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে।"

গয়ার কাজ সারিয়া মস্করী ভাবিলেন—বোধগয়ায় না যাওয়া ভাল নয়! পৃথিবীর একটা বড় তীর্থ-স্থান। সভার উপযুক্ত অনেক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। তাই ভাবিয়া বুদ্ধরক্ষিতকে লইয়া বোধগয়ায় গেলেন। বোধগয়ায় মন্দির তখন বড়ই বেমেরামত। যে অশ্বত্থগাছের তলায় বুদ্ধদেব বোধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ কাটা পড়ে শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্তের সময়, সে প্রায় চারি শত বৎসর। এই চারি শত বৎসরে গাছটা প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শিকড়ে বোধগয়ার মন্দির ফাটিয়া গিয়াছে। সেই মন্দিরের পিছনে তাহারই বারান্দার মধ্যে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। যেন গাছতলারই

বুদ্ধদেব ধ্যান করিতেছেন। মন্দিরটা রৌদ্রবৃষ্টি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। মন্দিরের হাতায় চারিদিকে পাথরের রেলিং, তাহাতে কতই চিত্রবিচিত্র কারিগরি। কিন্তু ফল্গু নদীর বালী পড়ায় হাতাটা প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরের দরজায় উঠিতে এখন আর পৈঠার দরকার হয় না। চারিদিকে বিহার, সেখানে নানাদেশের ভিক্ষু বাস করে ও তীর্থ করিতে আসে। মস্করী দুই তিন জন নেপালী, দুই তিন জন ভুটিয়া ও দুই তিন জন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য জেদ করিয়া গেলেন; তাহারাও যাইবে স্বীকার করিল। সেখানে আরও অনেক দেশবিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দুজন পারসী বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দু'জন ব্রহ্মদেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।

৬

তখন দুজনে পাটনা চলিলেন। গয়া হইতে পাটনা যাওয়ার রাস্তা ধরিলেন। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে খোদা প্রকাণ্ড দেবদেবীর প্রতিমা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। কাউ আডোল পাহাড়ে কাক বসিলে দুলিতে থাকে। তাহার একটু পরেই "খলতিক পবত" অর্থাৎ পর্ব্বতে চড়িলেই পা হড়কাইয়া যায়। সেই পর্ব্বতে উঠাই মুস্কিল, নামা ত আরও মুস্কিল। পর্ব্বতের উপর গুহা। গুহার ভিতর এমন মাজা, এত পালিস যে, মুখ দেখা যায়। সাদা, কাল, নীল রঙ, আর সুন্দর পালিস। গুহায় ঢুকিলেই মানুষের ছায়া পড়ে। একটা গুহায় এক জন তপস্বী আছেন, তিনি যে কত কাল চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, বলা যায় না। বীরাসনে বসিয়া আছেন, শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, রগ টিপিয়া গিয়াছে, নাকের হাড় নড়-নড় করিতেছে। মস্করী তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে খলতিক পর্ব্বত হইতে নামিলেন।

পাটলীপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহাভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। শোণনদী পাটলীপুত্রের পশ্চিমসীমা ছিল, সে সরিয়া ১০ ক্রোশ তফাতে গিয়া পড়ে। এখনও দু একখান নৌকা পুরাণপথে সময়ে সময়ে বর্ষাকালে যায়। কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের জলরাশি শোণ দিয়াই গঙ্গা নদীতে পড়ে। বসা নগরের উপর ক্রমাগত পলিমাটী পড়িয়া নগরকে যে কত নীচে নামাইয়া দিয়াছে, কে বলিতে পারে? তবে মাঝে মাঝে স্তূপের, জয়স্তম্ভের ও আকাশভেদী রাজবাড়ীর আগা দেখা যায়। এক জায়গায় অনেকগুলি থামের মাথা জাগিয়াছিল, ক্রমে সেগুলাও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পাটলীপুত্রের তিন শত্রু বলিয়া বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে;—জল, আগুন আর ঝগড়া। কাঠের নগর কয়েকবার আগুনে পোড়াইয়া দিয়া যায়। তাহার উপর জল-

প্লাবনে অজার পর্য্যন্ত ধুইয়া যায়, ঝগড়ায় নগরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। কিন্তু পাটলীপুত্র আবার উঠিত, আবার বড় হইত। কিন্তু বৌদ্ধেরা মনেও করিতে পারে নাই যে, উহার আর এক প্রবল শত্রু ছিল—ভূমিকম্প। সমস্ত নগরটা ১০।১২।১৫ হাত বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। পাটলীপুত্রের নাম "নগর।" মগধ শুদ্ধ লোক উহাকে নগরই বলিত। ইদানীং ভাঙ্গা নগরের নাম 'শ্রীনগর' হইয়াছিল।

মস্করী পাটালীপুত্রে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশেপাশে গ্রামগুলিতে আপনার কাজ সারিয়া বুদ্ধরক্ষিতকে বিদায় দিয়া তিনি নৌকায় চড়িয়া কাশীযাত্রা করিলেন।

৭

কাশী এ সময়ে ছুটি ছোট ছোট নগর। একটি মৃগদাব আর একটি অবিমুক্ত ক্ষেত্র। দুজায়গায়ই লোকজন অনেক; এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় বৌদ্ধ।

হিন্দু নগরটি একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিধারে। জলাশয়টি জ্ঞানবাপী। তাহার একদিকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আর এক দিকে অন্নপূর্ণার মন্দির। সে বিশ্বেশ্বরের মন্দির এখন আদিবিশ্বেশ্বর হইয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দির যেখানকার, সেইখানেই আছে। মধ্যে একটা হ্রদ, তাহারই নাম জ্ঞানবাপী। উহারই চারিদিকে সন্ন্যাসীদের বাস ও ব্রাহ্মণদের বাস। হ্রদ ক্রমে মজিয়া গিয়া তথায় নগরপত্তন হইয়াছে। জ্ঞানবাপী ক্রমে ছোট হইতে হইতে এখন একটি বাউড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাউড়ী মানে সিঁড়িওয়ালা কূয়া। তখনকার প্রধান দেবতা অবিমুক্তেশ্বর, তিনি এখনকার জ্ঞানবাপীর উপরেই বিরাজ করিতেছেন।

মৃগদাবের একদিকে দুইটি স্তূপ, দুইটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। কেবল সে দিন খুঁড়িয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদক্ষিন ও তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটি সিঁড়ি বাহির হইয়াছে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইহা ১৬০ ফুট উঁচা ছিল, ব্যাস ৪০ ফুটের উপর। গায়ে উজ্জ্বল পলস্তা করা। মাথায় বড় সোনার ছাতি। যেখানে ছাতি আরম্ভ, সেখানে একটি কিউবের চারিদিকে চারি জোড়া চোখ, আধ-বুজন্ত ভাবে ধ্যানময়, স্তূপগুলি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছোট প্রতিমা। সমস্ত বিশ্বই যেন ধ্যান-মগ্ন। এই স্তূপের পাশে ধর্ম্মরাজিকা, এখন ধামেকবালে। প্রকাণ্ড স্তূপ, ছাতা নাই, গাময় কঠিন পাথরের উপর নানা রকমের কাজ করা। এখন মাথাটা ভাজিয়া গিয়াছে, মেরামত না করিলে শীঘ্রই ভাজিয়া পড়িবে। মৃগদাবে বড় বড় বিহার। সব বেমেরামত—সাপ, বেজী ও ব্যাঙের আড্ডা। ইন্দুর-ছুঁচাও ঢের।

মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনা যায়, ভিক্ষু সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। একটা পুরাণ বিহারের ঢিবির উপর একটা নূতন বিহার হইল, পুরাণ সব জিনিস ঢাকা পড়িল। মানুষের চক্ষেই ঢাকা পড়িল, সাপের চক্ষে ত নয়। সাপ তাহার উপরে বসিয়া বেশ বংশ-বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। নূতন বিহারের যে পাঁচীলটা পুরাণ বিহারের পাঁচীলের উপর পড়িল,সেখানটা বেশ রহিল, তাহার এ পাশ ও পাশ গোড়া হইতেই বসিতে লাগিল, অল্পদিনেই পাঁচীল ফাটিল, ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেরামত করে কে? দেশে ক্রমেই হিন্দুর প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়া উঠিতেছে। বৌদ্ধ-মন্দির মেরামতের সময় টাকা জুটে না।

এই দুই নগরেই মস্করী অনেকগুলি ভাল ভাল লোক নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে বেদান্তী চিৎসুখাচার্য্য। একজন বৃদ্ধ উদয়নাচার্য্য বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনিও যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচর্য্যার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী শ্রীহীর পণ্ডিত কাশীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও কাশীতে ছিলেন। ইহাঁরা দুজনেই নিমন্ত্রণ পাইলেন।

মৃগদাব ও অবিমুক্তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে রাজবাড়ী। রাজা স্বাধীন নন, কান্যকুব্জেশ্বরের সামন্ত। কিন্তু তিনি থাকেন স্বাধীন রাজার ন্যায়। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের রাজা বলিয়া তাঁহার যে একটা বিশেষ সম্মান ছিল, তাহা আর কাহারও ছিল না। তিনি সকল দেশের পণ্ডিতেরই সম্মান করিতেন এবং সকল দেশের লোককেই কাশীবাসের সুবিধা করিয়া দিতেন। মস্করী প্রথম হইতেই রাজার সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রাজার সাহায্যও সকল বিষয়েই পাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই মস্করীর এক মহাবিপদ্ উপস্থিত হইল। পঞ্জাব হইতে একজন রাজদূত কাশীর রাজসভায় উপস্থিত হইল। তিনি মস্করীর প্রধান শত্রু হইলেন। দুজনেই আসিয়াছেন লোক নিমন্ত্রণ করিতে। একজন পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া পূবে লইয়া যাইবেন আর পুরস্কার দিবেন। আর একজন পশ্চিমে লইয়া যাইবেন, আর যুদ্ধ করাইবেন। দুই জনে অনেকবার রাজসভায় বাগ্বিতণ্ডা হয়। পঞ্জাবের রাজদূত বলেন, রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার এ সময় নয়। তিনি বলেন, প্রবল শত্রু হিন্দুদিগের সীমান্তে হানা দিতেছে। পূর্ব্বেও অনেকবার এরূপ হানা দিয়াছে। কিন্তু যাহারা দিয়াছে, তাহারা ঠাকুর মানিত, দেবতা মানিত, ব্রাহ্মণ মানিত, আচার মানিত, প্রতিমাপূজা করিত, আগুনপূজা করিত, সূর্য্যপূজা করিত, জলপূজা করিত, মাটীপূজা করিত, অনেক বিষয়েই আমাদের মতই ছিল। কিন্তু এ এক বিচিত্র জাতি আসিয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মও বিচিত্র। ইহাদের মতে দেবতা মানা মহাপাপ। প্রতিমাভঙ্গ মহাপুণ্য।

জল, মাটী, সূর্য্য জড়পদার্থ, দেবতা নহে, মানুষ নহে, জীবও নহে। ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের জাতি নাশ করে, পইতা ছিঁড়ে দেয়। আচার মানে না, বিচার মানে না। পঞ্জাব ইহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত। ইহারা বরাবর পঞ্জাব লুঠ করিয়াছে, কাশ্মীর লুঠ করিয়াছে, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে উৎসন্ন দিয়াছে। অনেকে প্রাণ লইয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীহীর পণ্ডিত দেশত্যাগী, তাঁহার পুত্র দেশত্যাগী, কত কত পণ্ডিত যে কাশ্মীরত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অমন যে আমাদের তীর্থ জ্বালামুখী, তাহা লুঠিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যে নগরকোটের ব্রাহ্মণেরা আভিজাত্যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অগ্রগণ্য,যাহাদের হাতে ভাত খাইতে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না, সেই নগরকোট এখন শ্মশান হইয়াছে। এই কি সময় রাজসভা করিয়া গুণের পুরস্কার দিবার? এ সময় যদি সকলে প্রাণপণে আত্মরক্ষা না করেন, ২।৫ বছরের মধ্যে আপনারাই কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই, আবার আপনাদের গুণ? এখন কেবল সাজসাজ্জা, কেবল রণসজ্জা। আমি অনহিল গিয়াছিলাম, শাকম্ভরী গিয়াছিলাম, ধারায় গিয়াছিলাম, ত্রিপুরী গিয়াছিলাম, খাজুবাহা গিয়াছিলাম, দিল্লী গিয়াছিলাম, কনৌজ গিয়াছিলাম, মাণ্ডো গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বড় একটা বকাবকী করিতে হয় নাই। পঞ্জাব হইতে, কাশ্মীর হইতে, নাগরকোট হইতে, থানেশ্বর হইতে পলাতক সর্ব্বস্বান্ত লোকজন আসিয়া আমার সব কাজ করিয়া দিয়াছে। দু'এক জায়গায় আমায় বাঙ্‌নিষ্পত্ত করিতে হয় নাই। ইহারাই আমার কাজ সারিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে আপনি আর যাইবেন না, সমস্ত দেশের লোক এক-হাড় এক-প্রাণ হইয়াছে। দেখুন, রাজপুতেরা যদি রক্ষা না করিত কাসিমের পুত্র মহম্মদ সিন্ধু জয় করিয়া ঐ পথে বরাবর অনেক দূর আসিয়া পড়িত? তাহারা তিন শত বৎসর ধরিয়া এক প্রান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার আর একপ্রান্তে বিপদ্ উপস্থিত। এ সময়ে কেবল যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, বিপক্ষদমন ও বিপক্ষনাশন। এটা বারোয়ারির সময় নয়। বঙ্গাধীশ সাতগাঁ রাজ্য জয় করিয়াছেন—বেশই করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সামর্থ, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করুন। সশস্ত্রে সমস্ত প্রজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নহিলে এ সময়ে উৎসব, আনন্দ, দানধ্যান আরম্ভ করিলে সব লোপ হইয়া যাইবে, আর উৎসব করিতে হইবে না, আর দান করিতে হইবে না, আর ধ্যান করিতে হইবে না। আপনি দেশে ফিরিয়া যান, বঙ্গাধিপতিকে সব কথা বুঝাইয়া বলুন। রাজসভা ছাড়িয়া দিতে বলুন। যুদ্ধের সজ্জা করিতে বলুন। আমিও সত্বর তাঁহার সভায় উপস্থিত হইব।”

৮

মঙ্করী শুনিলেন। রাজদূতের ভাষায় ও ভঙ্গীতে বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর

হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে যে কি, তাঁহার ধারণা হইল না, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। কাশীর লোকেও যে বড় বুঝিল, তাহা নহে। তাহারাও বুঝিল, দূরে—কত দূরে তাহার ঠিকানা নাই—একটা বিপদ্ উপস্থিত; কিন্তু তাহাতে আমাদের কি? আমরা কেন এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাই? এই ভাবের একটা যেন আধসত্য একটা বিপদের ধারণা হইল। তাহারা মাতিল না। দুচার জন ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিল, এই মাত্র।

মস্করী কাশীর কাজ সারিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া কনোজ যাত্রা করিলেন। মাঝে প্রয়াগ, ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানদান করিয়া গঙ্গা বাহিয়া কনৌজ গেলেন। নৌকা লাগিল ডাঙ্গায় নহে, প্রায় ওপারে একখানা নৌকার গায়ে। সমস্ত গঙ্গাটা নৌকায় ভরা। ও পার ভিন্ন আসা-যাওয়ার পথ নাই। মস্করী নৌকার ছৈয়ের উপর দিয়া কনৌজের ঘাটে পা দিলেন। সহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘে, গঙ্গার ধারে, এবং প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। ঠিক মধ্যস্থলে রাজবাড়ী। রাজপুত-প্রতিহার-বংশের মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল রাজা। তাঁহার রাজত্ব শতদ্রু নদী হইতে বিহারদেশ পর্য্যন্ত। কাশী, মথুরা, দিল্লী তাঁহার সামন্তরাজ্য। তাঁহাদের রাজত্ব আরও বিস্তৃত ছিল। যমুনার দক্ষিণধারটা এখন স্বাধীন হইয়াছে। আর প্রতিহারদের আদিভূমি রাজপুতানা ও সেখানকার প্রতিহারেরা, কনৌজের অধীন নহে, স্বাধীন হইয়াছে।

মস্করী এত বড় সহর কখনও দেখেন নাই। কনৌজ, একাধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান ও সেনানিবাস। সুতরাং সহর যে বড় হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সহরে আসিয়া মস্করী দেখিলেন, সকলের মুখেই ঐ এক কথা;—মুসলমান আসিতেছে। সকলেই সাজিতেছে, নিতান্ত শিশু ও বৃদ্ধ, নিতান্ত কাণা, খোঁড়া, আতুর ও অন্ধ ছাড়া সকলেই সাজিতেছে। জাতিভেদও মানিতেছে না। ব্রাহ্মণও সাজিতেছে, ক্ষত্রিয়ও সাজিতেছে, বৈশ্যও সাজিতেছে, শূদ্রও সাজিতেছে, পাহাড়ীও সাজিতেছে, জঙ্গলীও সাজিতেছে। শুনিলেন, পানওয়ালীরা যাহা উপায় করিয়াছিল, যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, সব দিয়া দিয়াছে। তাহাতে প্রায় এক কোটি টাকা হইয়াছে। কনৌজের পান খুব বিখ্যাত। প্রায় এক হাজার পানওয়ালী ছিল; তাহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছে। রাজমহিষী বাপের দেওয়া এক জোড়া হীরার বালামাত্র আইওতের চিহ্ন রাখিয়া বাকী সব গহনা দিয়া দিয়াছেন। রাজা এক বৎসরের রাজস্ব—যাহার নাম রাজার সর্ব্বস্ব, দিয়া দিয়াছেন। ব্যবসাদারেরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়া দিয়াছে। শিল্পীরা এক বৎসরের আয় দিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগ উপকরণ রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে, সংগ্রহ হইতেছে, জমা হইতেছে ও চালানবন্দী হইতেছে। অনঙ্গপালের খবর আসিলেই রওয়ানা হইয়া যাইবে। মস্করীর রাজসভার কথা কেহই শুনিতে চাহে না। শুনিবে কি? পঞ্জাব ধ্বংস করিতে পারিলেই কনৌজ—মাঝে আর কিছুই নাই। অনঙ্গ-

পাল তাই কনৌজে অনেক লোক পাঠাইয়াছেন। তাহারা কনৌজের লোককে বেশ বুঝা-ইয়া দিয়াছে যে, বিপদ আসন্ন। তাই সবাই মাতিয়াছে। আহা! এমন সোনার কনৌজ ছারখারে যাবে গো? এ কথা যাহারই মনে হয়, সেই সর্ব্বস্ব পণ করে, প্রাণ পণ করে। মস্করীর কথা কেহ শুনে না। শুনিবে কি? তিনি অনেকবার ভাবেন, "ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাজসভা করিব, না বলিলেই ভাল হইত। আমিও সাজিতে পারিতাম। আমার আর কে আছে? সনাতনধর্ম্মের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত দিতামই, প্রাণটাও দিতাম। এমন বিপদ্ উপস্থিত জানিলে কি এমন কার্য্য করি? আমাদের দেশে এত কাণ্ডের কোনই খবর নাই, মগধেও ত নাই। এখন করি কি? আরও যাইব কি? যাইয়া ফল নাই, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিব। নানা দেশ দেখিবার, নানা তীর্থ করিবার কত বাঞ্ছা ছিল; কিন্তু যদি নিমন্ত্রণই না করিতে পারি, বৃথা অর্থব্যয়েরই বা দরকার কি? বৃথা পরিশ্রমেরই বা কারণ কি? তবে এখান হইতেই ফিরিব কি? এখনও ত দিন আছে? ফিরিব কি?" আবার ভাবিলেন:—"দেখিলাম ত কনৌজই এখন ভারতের প্রাণ। এইখানে বসিয়াই ভারতের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লই। তাহার পর যাহা বিবেচনা হয়, করিব।"

মস্করী মাসখানেক কনৌজে রহিলেন, অনেক দেশের অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কহিলেন; কিন্তু সব বৃথা হইল। সকলেই বলিল, রাজসভার এ সময় নয়। পরম শত্রু দরজায় ঘা দিতেছে। ইহারা আসিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ হইয়া যাইবে। এখন একমনে এক প্রাণে যাহাতে উহাদের হটাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। মস্করী করেন কি? মথুরা-বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে ফিরিলেন। রাজসভাটা যে বিশেষ জমিবে না, এই তাঁহার দুঃখ। কিন্তু রাজসভার পর বাঙ্গলাকেও দেশরক্ষায় মাতাইতে হইবে। হয় ত নিজেও যুদ্ধে যাইতে হইবে।

রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্য বিহার—চারিতালা উচা। এখনকার লাট সাহেবের বাড়ীতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দুতালা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারও ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দু'তালা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুতালার উপর সিঁড়ির সাম্‌নেই একটা খোলা চাতাল, তাহার বাহিরে বারান্দাটি চারিদিক্ ঘুরিয়া গিয়াছে। বারান্দার ওপাশে সারি সারি ঘর। বারান্দার নীচে একতালায় এক প্রকাণ্ড উঠান, তাহার এক কোণে একটি প্রকাণ্ড ও গভীর কূয়া। কিন্তু বারান্দার নীচে নীরেট পাঁচীল, একটিও দুয়ার বা জানালা নাই। উঠানে নামিবার বা কূয়া ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায় একটি সিঁড়ি দিয়া নামা। দুতালার বারান্দার উপর তিনতালার বারান্দা, তাহারও চারিদিকে ঘর। এইরূপ চারতালায়ও বারান্দা ও ঘর। সিঁড়ির সাম্‌নে দুতালায় যেখানে

খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তেতালা ও চৌতালায় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।

অধ্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত খুব লম্বা-চওড়া, বেশ সুপুরুষ, এখন পঁচাশী বছর বয়স হইয়াছে, তথাপি দেহের ও মনের বেশ জুত আছে। বিহারের নিয়মমত তাঁহার বার জন চাকর আছে। পালা করিয়া তিন জন তিন জন দিন-রাত্রি তাঁহার কাছে থাকে। প্রত্যহ সকালে তিনি একবার নামিয়া আসেন, নালন্দার বড় রাস্তায় খানিক পাইচারি করেন, তাহার পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া নালন্দার বড় দীঘীতে স্নান করিয়া উপরে উঠেন, উঠিয়াই আহার করেন। আহারান্তে বসিয়া বসিয়া কিছু বিশ্রাম করেন। দিবানিদ্রা ত একেবারেই নাই, রাত্রিতেও "শয়নং যোগিনিদ্রয়া।" বিশ্রামের পরই কার্য্য আরম্ভ। তিনি যে কেবল বালাদিত্য বিহারের কর্ত্তা, শুধু তাই নয়; নালন্দায় সমস্ত বিহারই তাঁহার কথায় চলে। বিদ্যার্থী বা পড়ুয়াদের যে সন্দেহ আর কেহই মিটাইতে পারিত না, তাঁহার কাছে আসিলেই সে সন্দেহ মিটিয়া যাইত। তিনি পুরাদস্তুর মহাযানপন্থী ছিলেন। মহাযানের মূলগ্রন্থগুলি টীকা-টিপ্পনীর সহিত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

একদিন বিশ্রামের পর বুদ্ধরক্ষিত পিশাচখণ্ডীকে লইয়া সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচখণ্ডী চারিতলা হইতে নালন্দার শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সারি সারি বিহার ও সারি সারি স্তূপের পর—যে দিকে চাহেন—কেবল পড়ুয়াদের কুটী। বিহারগুলি যদিও কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও বেমেরামত আছে, কিন্তু পড়ুয়াদের কুটীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়ুয়ারাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহাদের অধিকাংশই পাঠে তন্ময়। সমস্ত জায়গাটিই যেন সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র। পিশাচখণ্ডী নিজে ব্রাহ্মণ ও ঘোরতর বৌদ্ধদ্বেষী। তিনি উহাদিগকে অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, নাস্তিক, অতিপাষণ্ড বলিয়াই জানেন। কিন্তু এখানে আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন তাঁহার মনের ভাব বদল হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতকে বলিলেন :—

"ভদন্ত, আমি বঙ্গাধিপতি শ্রীহরিবর্ম্মদেবের দূত হইয়া আসিয়াছি। তিনি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সাতগাঁয় রাজসভা করিবেন। সেখানে কাব্যে, শাস্ত্রে, শিল্পে ও কলায় পারদর্শী লোকগণকে পুরস্কার দিবেন। আপনি নালন্দা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন পণ্ডিতকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন।"

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত।—মহারাজাধিরাজের সঙ্কল্প অতি উত্তম। আমাদের এখানে বজ্রদত্ত এক জন মহাকবি। তিনি ছয় ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। তাঁহার লোকেশ্বর-শতক বৌদ্ধদের বড় আদরের জিনিস। তিনি ত যাইবেনই। শিল্পীও জনকতক পাঠাইব। বিশেষ কয়েকজন ভাস্কর যাইবে, কতকগুলি কষ্টিপাথরের কাজ

লইয়া যাইবে। তবে শাস্ত্রে প্রবীণ লোক লইয়া খুবই গোল। কারণ, আমরা নালন্দায় তন্ত্রটাকে শাস্ত্র বলিতেই রাজী নই; বজ্রযান, সহজযান আমরা একটা যান বলিয়াই মনে করি না, আমরা বড়জোর মন্ত্রযান পর্য্যন্ত মানিতে পারি। তবে আমার বোধ হয়, প্রজ্ঞাকরমতি এখন এইখানেই আছেন। তিনি যদিও নালন্দার পড়ুয়া নহেন, তিনি অনেক সময়ই নালন্দাতেই থাকেন। বিশেষ, তিনি যে বোধিচর্য্যাবতারের টীকা লিখিতেছেন, তাহার জন্য যে সকল পুথি-পাঁজীর দরকার, সে সকল ত এইখানেই কেবল আছে, অন্যত্র পাওয়া যায় না। তাই তাঁহাকে এইখানেই থাকিতে হইয়াছে। মহাযান শাস্ত্রে তিনি একজন পণ্ডিত বটেন। আমরা তাঁহাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত এই কথা বলিতে না বলিতেই একজন বেঁটেখেটে ভিক্ষু দুই জন পড়ুয়া সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত—তিনি আসিবামাত্র সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"এই যে, অনেক দিন বাঁচিবে, তোমারই নাম হইতেছে।"

"আমি কি পুণ্য করিয়াছি যে, আচার্য্য ভদন্ত মহাপণ্ডিত পিণ্ডপাতিক মহোপাধ্যায় সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতের স্মৃতিপথে উদিত হইবে?"

"তোমার মত পুণ্যবান্ আর কে আছে? যে বোধিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতে করিতে আচার্য্য শান্তিদেব এই নালন্দা হইতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই বোধিচর্য্যাবতারের ব্যাখ্যা করিতেছ, টীকা লিখিতেছ। তুমি দেশসুদ্ধ লোকের স্বর্গের পথ খুলিয়া দিতেছ।"

প্রজ্ঞাকর।—আমিও আজ সেই বোধিচর্য্যা লইয়াই আসিয়াছি।

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥

এ স্থলে 'নিরালম্ব' কথাটার অর্থ কি? ভাব ও অভাবও নাই। তাহা হইলে ত কিছুই রহিল না। তবে 'নিরালম্ব' কে হইল?

সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত।—ও সকল অতি গুহ্যকথা। সে গুহ্যভাব ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া 'নিরালম্ব' বা যা'হক এমনি একটা কথা দ্বারা তাহার কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিভৃতে আর এক সময় আসিও, বুঝাইয়া দিব। এখন তোমার আমার একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে। তোমাকে একবার সাতগাঁয়ে যাইতে হইবে।

প্রজ্ঞা।—আমার প্রতি হঠাৎ এ নির্ব্বাসনদণ্ড কেন?

সর্ব্বজ্ঞ।—এ যেমন তেমন নির্ব্বাসন নয় হে—অনেক ভাগ্যে এইরূপ নির্ব্বাসন ঘটে। এই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে দেখিতেছ—ইনি সুপণ্ডিত, সুবক্তা, ইনি বঙ্গাধিপের

নিকট হইতে আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ কাব্যে ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে পুরস্কার করিবেন। তাই আমাদের ইচ্ছা, তুমিই যাও।

প্রজ্ঞা।—আমরা ত ভিখারী। পুরস্কার লইয়া কি করিব?

সর্ব্বজ্ঞ।—ও কথা বলিও না। পুরস্কার অকিঞ্চিৎকর জানি, কিন্তু উহাতে বিদ্যার যে গৌরব, তা'ত অকিঞ্চিৎকর নয়। সেইটার আদর করা উচিত। না করিলে দোষ আছে।

প্রজ্ঞা।—প্রভু আদেশ করেন ত যাইতেই হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ।—শুধু তুমি একেলা যাইলে হইবে না। এখানে যে যে পণ্ডিত ও কবি আছেন, সকলকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মে—ত্রিমূর্ত্তি

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিব্যক্তির পথে ত্রিমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজেও ত্রিমূর্ত্তি দেখা দিয়াছে।

রাজা রামমোহন হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তির যে গর্হিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আশঙ্কাও হয়, কেন না, দৈবাৎ যদি কোন ভদ্র ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকা আমার এই লেখা পড়েন, তবে রামমোহনের রুচি দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

রামমোহন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের চরিত্রদোষ যেরূপ নির্লজ্জভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা দেবতা বলিয়াই তাঁহারা ক্ষমা করিয়াছেন। মনুষ্যের হইলে রামমোহনকে এজন্য আদালতে দাঁড়াইতে হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি—মনুষ্য। মনুষ্যোচিত দুর্ব্বলতা তাঁহাদের মধ্যে থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক। ধর্ম্ম-জীবনের ক্রম-বিকাশ দেখাইতে যাহা অপরিহার্য্য, তাহা ছাড়া ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে ত্রিমূর্ত্তি,—রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। আমার আলোচ্য দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের আগে রামমোহন, পরে কেশবচন্দ্র। কোন্ উপমা দিয়া এই ত্রিমূর্ত্তিকে বুঝান যায়? ইহারা কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর?

রামমোহন নিশ্চয়ই ব্রহ্মা হইতে রাজী হইবেন না। কেন না, ঘোর বৈদান্তিক হইলেও জীবের সৃষ্টিশক্তি নাই, এ কথা তিনি মানিতেন। আর তা ছাড়া ব্রহ্মার যে চরিত্রদোষের কথা রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন—এমন কি শৈব বিবাহের দিক্ হইতেও তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কাজেই রামমোহন ব্রহ্মা হইতে পারেন না।

দেবেন্দ্রনাথ কি বিষ্ণু হইতে রাজী হইবেন? শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুর অবতার। আবার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতার। অবতারবাদের যিনি ঘোর বিরোধী, ১৮৬৮ খৃঃ মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রের প্রতি 'নর-পূজার' আরোপকে যিনি এত মতে ধিক্কৃত করিলেন, মহাপ্রভু 'ভ্রান্ত অকিঞ্চিৎকর অবতার' বলিয়া যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইলেন, তিনি নিজে বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অবতারবাদের প্রশ্রয় দিবেন কি করিয়া? আর রূপোল্লাস ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা,—'বিলাসের আমোদে'

যখন ডুবিয়াছিলেন, তখন যাহাই হউক, শেষে হিমালয়ে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের ধ্যানেই তাঁহাকে মগ্ন করিয়াছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য ও শাঠ্য তিনি গ্রহণ করিবেন কিরূপে? পিতৃঋণ তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন, শাঠ্য অবলম্বন করেন নাই। এ কথা তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিবে না। বাঙ্গলায় গত শতাব্দীর নীতিধর্ম্মের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তবে কেশবচন্দ্রই বা মহেশ্বর হইতে রাজী হইবেন কেন? পশ্চিম-সমুদ্র যখন তাহার নীলোজ্জ্বল তরঙ্গ দ্বারা বাঙ্গলার তটভূমিকে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতেছিল, তখন সেই মথিত লবণাম্বুরাশি হইতে যে খৃষ্টধর্ম্মের 'মোহিনী' মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল, কেশবচন্দ্র অবশ্য সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ-বিহ্বল-চিত্তে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কোথায়ও ত সাদৃশ্য মিলে না। মহেশ্বর বিষপান করিয়াছিলেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের * মত তিনি যে সুরাপান করিতেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? অতএব কেশবচন্দ্র মহেশ্বর হইতে নারাজ।

তবে আর কোথায় উপমা খুঁজিয়া পাইবে? হিন্দুর ব্রহ্ম-বিদ্যার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে কি এই উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে?

বেদে—ব্রহ্ম, উপনিষদে—পরমাত্মা, পুরাণে—ভগবান্। ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি কি ক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান্? রামমোহন—ব্রহ্ম, দেবেন্দ্রনাথ—পরমাত্মা আর কেশবচন্দ্র ভগবান্?

বেদে ব্রহ্মের বিকাশ দেদীপ্যমান, তাঁহার শক্তির পরিমাণ হয় না, তাঁহার প্রকাশের অন্ত নাই। উপনিষদে—ব্রহ্মের বাহিরের বিকাশ সঙ্কুচিত, তিনি জীবের আত্মায় পরমাত্মরূপে যোগে অবস্থান করিতেছেন। পুরাণে—ভগবানের লীলাময়রূপে আবির্ভাব। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে তাঁহার লীলা তরঙ্গিত। তিনি ভগবান্‌রূপে দেখা দিলেন।

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের লীলাতরঙ্গে কেশবচন্দ্রই ভগবান্‌কে দেখিলেন। জীবাত্মায় পরমাত্মায় যে মুখোমুখী ভাব, যে নিবিড় ঐকান্তিক যোগ, দেবেন্দ্রনাথের সাধনাই তাহা ব্যক্ত করিল। ব্রহ্মের যে অপরিমেয় শক্তি, অনন্ত প্রকাশ, রামমোহনের প্রতিভা, তাঁহার জীবনের বিচিত্র কার্য্যাবলীই তাহার প্রমাণ।

উপমা ছাড়িয়া, কল্পনা ছাড়িয়া এইবার আমরা বাস্তবে পদার্পণ করিব। আমাদের

---

* দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বাবুকে একখানা চিঠিতে লিখিতেছেন—"মদ্যপান পরিত্যাগ হইল, এইরূপ মৎস্য-মাংস পরিত্যাগ হইলেই হয়। এই চিঠিতে তারিখ নাই, তবে ১৮৫১ খৃঃ পরে হইবে, ইহা বুঝা যায়।

আলোচ্য ত্রিমূর্ত্তি—ঈশ্বর নহেন, দেবতা নহেন, দৈত্যও নহেন। তাঁহারা রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁহারা ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ, পিরালী ও বৈদ্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই নীচকুলোদ্ভব নহেন,—তাঁহারা কেহই দরিদ্র ছিলেন না। তাঁহারা তিন জনেই স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের, ধর্ম্মপ্রচারকদের চিন্তার সাহায্য তাঁহারা লইয়াছিলেন। তাঁহারা সৌভাগ্যবান্, সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

অথচ এত সত্ত্বেও বাঙ্গলা তাঁহাদের কথা শুনিল না। কেন শুনিল না? তাহা একদিনে বলা যায় না, তাহা একজনে বলিতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথের প্রচারস্রোতে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের সিংহাসন টলমল করিল। আভিজাত্য আভিজাত্য দ্বারা সংক্রামিত হইল। আভিজাত্যের একটা মোহ আছে। সংস্কারক্ষেত্রেও সেই মোহ কিয়ৎকালের জন্য কার্য্যকারী হইয়াছিল। কিন্তু কি এই প্রচার যেখানে রাজাদেশে ব্রাহ্মণ আচার্য্য পাঠাইতে হইল—শূদ্র আচার্য্য প্রত্যাখ্যাত হইল? আর কতটুকুই বা এই স্রোত—যাহা আজ বাদে কা'ল শুকাইয়া গেল। পলাশীর যুদ্ধের কৃষ্ণনগর, ব্রাহ্মণ্যপ্রধান কৃষ্ণনগর, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের এক বৃহৎ অংশের পরিচালক যে কৃষ্ণনগর,—দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কেবল তাহার জীর্ণ অস্তিত্বের ভার বহন করিতেছিল মাত্র। বর্দ্ধমান বলেন, তিনি বাঙ্গালী নহেন। ফুরাইয়া গেল। যিনি বাঙ্গালী নহেন,—বাঙ্গলায় তাঁহার কি, অধিকার?

বাঙ্গলায় আভিজাত্যের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মস্রোত চারিদিকে ছড়াইতে পারিল না। আভিজাত্যের তপ্ত বালুকায় তাহা শুকাইয়া গেল। সময়বিশেষে আভিজাত্য কেবল একটি কার্য্য দ্বারা জাতির উপকার করিতে পারে, তাহা হইতেছে আত্মহত্যা।

ত্রিমূর্ত্তি সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্ম-স্রোত প্রবাহিত হইতে পারিল না, প্রতিহত হইল। কোথায় প্রতিহত হইল? যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভাগ্য, যেখানে জল অনাচরণীয়, যেখানে তিনি অস্পৃশ্য, সেইখান হইতে এই স্রোত প্রতিহত হইল। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সেখানে গেল না, কেশবচন্দ্রের ইংরেজী বক্তৃতার একটা ক্ষীণ শব্দও তাহাদের কানে পৌঁছিল না। দরিদ্রের বাঙ্গলা, ভাগ্যহীনের বাঙ্গলা, মূর্খের বাঙ্গলা, জল অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতি সকলের বাঙ্গলা অভিজাত্যের ধর্ম্মকে এইরূপে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজ একশত বৎসর ধরিয়া। ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ কোন রকমে কায়ক্লেশে সহরের দুই তিনটা গলির মধ্যে পড়িয়া ধুঁকিতেছে মাত্র। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

সকল প্রকার রাজনৈতিক উচ্চাধিকারলাভের চেষ্টায় যে বাঙ্গালীর ব্যর্থতা, তাহারও কারণ এই। এখানেও বলিব যে, ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি দেখিলাম। এইবার সংক্ষেপে ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিমূর্ত্তি দেখিতে

হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের এই ত্রিমূর্ত্তির সহিত দেবেন্দ্রনাথের সংযোগ ও বিচ্ছেদ বুঝিতে পারিলে, একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসও অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া দেখা দিবে।

ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিমূর্ত্তি কি ?

ব্রহ্ম-সভা, আদি-সমাজ, নব-বিধান। ব্রহ্ম-সভাকে দলিলপত্রে ব্রহ্ম-সমাজও বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সভা রামমোহনের, আদি-সমাজ দেবেন্দ্রনাথের, নব-বিধান কেশবচন্দ্রের।

এইবার অতি সংক্ষেপে ইহাদের ইতিহাস আলোচনা করিব; এবং সেই ইতিহাসের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কি, তাহাও নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মগণ ১১ই মাঘকে অতি পবিত্র দিন মনে করেন। প্রতি বৎসরে এই দিনে তাঁহারা উৎসব করিয়া থাকেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ উৎসব করিত, বৈষ্ণবেরা যেরূপ উৎসব করেন, বাঙ্গলা দেশের বহুস্থানে ও তীর্থাদিতে যেরূপ মেলা বসিয়া থাকে, ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব ঠিক সেরূপ নহে। এই উৎসবে একটা সভা আহূত হয়। ব্রাহ্মপুরুষগণ, বিশেষভাবে ব্রাহ্ম-মহিলাগণ উত্তম রঙীন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া এই সভায় আগমন করেন। একজন আচার্য্য বেদীতে বসিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন। উপাসনা ইংরাজীতেও হয়, কখনও বাঙ্গলাতেও হয়, আবার সংস্কৃত স্তোত্রপাঠও হয়। ব্রাহ্মমহিলাগণ সুরযন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত করেন—তালযন্ত্র প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। রাজা রামমোহনের সময় তালযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। গোলাম আব্বাস্ তখন পাখোয়াজ বাজাইতেন। সভাগৃহ, যাহাকে ব্রাহ্মরা মন্দির বলেন, রঙীন কাপড়ে ও ফুলপাতায় সজ্জিত হয়। উপাসনার পর বক্তৃতা হয়, ভোজের ব্যবস্থাও কখন হয়। ব্রাহ্মগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া ভিন্ন প্রদেশের এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মরা বৌদ্ধদের মত খালি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথ তাহারা উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তবে কি ব্রাহ্মরা উপাসনার সময় ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইবে ?"

নানারূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এই উৎসবের আধুনিক আকার ও প্রকার হইতে যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে আমাদের জাতীয় ভাব ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে। রামমোহনের 'ব্রহ্ম সভাকে' ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহার মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তাহা খৃষ্টান ভজনালয়ের অনুকরণে বিশেষত্ব। সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে জাতীয় ভাবের অসচ্ছলতা দেখিয়াই অনেকটা প্রতিবাদের ভাব হইতেই নবগোপাল মিত্রের 'জাতীয় মেলার' সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্ম-আন্দোলনে তখন কেশবচন্দ্রের যুগ। দেবেন্দ্রনাথ তখনও অস্তগামী। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় খৃষ্টের অবতারবাদ, দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছেদ, মুঙ্গেরে খৃষ্টপূজার

অনুকরণে নরপূজা, :জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলনের প্রস্তাব—এ সমস্তই খৃষ্টানী সংস্কার বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং করাইয়াছিলেন। 'জাতীয় মেলা' কেশব ও কেশবদিগের বিরুদ্ধে এইরূপ একটা প্রতিবাদ হইতেই উত্থিত হইয়াছিল; এবং দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক দিক্ দিয়া হিন্দুসমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা এই 'জাতীয় মেলা'র পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অনেক গণ্যমান্য হিন্দু—যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দেন নাই, তাঁহারাও এই মেলার সংস্রবে আসিয়াছিলেন।

'জাতীয় মেলা' ব্রাহ্ম-উৎসবের প্রতিবাদ হয়, হউক। আমরা ব্রাহ্ম-উৎসবের এই ১১ই মাঘ তারিখটির প্রতিই দৃষ্টিপাত করিব। কেন না, এই তারিখটিই ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস-মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

ইতিহাসের পথে প্রয়াণ করিতেছি, কিন্তু প্রবেশদ্বার ত একটি বলিয়া মনে হয় না। ১১ই মাঘ ব্রাহ্মগণ উৎসব করেন। এই দিনটিকে তাঁহারা বিশেষভাবে স্মরণ করেন। অনন্ত কালস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই দিনটিকে তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিতে চাহেন। কেন? এই দিনে কি হইয়াছিল? জগতের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ কি এই দিনে প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল? অন্ধতিমিরাবৃত ব্রাহ্ম-গগনে এই দিন কি প্রথম প্রভাত? অথবা মূর্ত্তিপূজাকে পরিহার করিয়া একেশ্বরবাদমূলক যে নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনা, তাহার জন্য এই দিন প্রথম একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল? অথবা, ব্রহ্মোপাসনার জন্য এই দিন একটি 'সভা'-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

১১ই মাঘ ব্রাহ্মদিগের স্মরণীয় কি?

—ব্রাহ্ম-মতবাদের প্রথম প্রচার?

—ব্রহ্ম-উপাসকদিগের প্রথম সম্প্রদায়-সংগঠন?

—অথবা, 'ব্রহ্ম-সভা'-গৃহের প্রথম প্রতিষ্ঠা?

ইতিহাস বলে, ১১ই মাঘে ইহার কিছুই হয় নাই।

যদি রাজা রামমোহনকে এ যুগে ব্রাহ্ম-মতবাদের প্রথম প্রচারক বলিয়া ধরা যায়, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কোনও ১১ই মাঘ তিনি এই ব্রাহ্ম-মতবাদ প্রথম প্রচার করেন নাই। ১৭৯০খৃঃ তিনি প্রচলিত মূর্ত্তিপূজাকে আক্রমণ করিয়া যে গ্রন্থ লেখেন, এবং মূর্ত্তিপূজার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা মনে করা অন্যায় হইবে না যে, ব্রাহ্মগণ এক্ষণে যে বৎসরের ১১ই মাঘকে স্মরণ করেন, তাহার অন্ততঃ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে; এবং রামমোহনই তাহা প্রচার করিয়াছেন। তাহার পর ১৮০৯—১৮১৪খৃঃ,—এই ৬ বৎসর দেওয়ান রামমোহন রংপুরে তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর যে ধর্ম্মালোচনার জন্য

সভা করিতেন, তাহাতে বিশেষ করিয়া মূর্ত্তিপূজার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইত। সেখানেও হিন্দু আসিতেন, মুসলমান আসিতেন, মাড়োয়ারী বণিকেরা পর্য্যন্ত আসিতেন। খৃষ্টান তেমন বিশেষ কেহ ছিলেন না বলিয়াই হয় ত আসিতেন না। আর আসিতেন যে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অন্ততঃ কোন ধর্ম্মের লোকেরই আসিতে বাধা ছিল না। রংপুরের ব্রহ্ম সভা স্মরণীয় না হইয়া কলিকাতার ব্রহ্ম-সভা স্মরণীয় হয় কেন?

রামমোহন ১৮১৪ খৃঃ রংপুর হইতে কলিকাতা আসিলেন। রংপুরের ব্রহ্ম-সভাকেও সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু অবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীও রংপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা আসিলেন। রামমোহনগুরু এই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তান্ত্রিক বামাচারী সাধক ছিলেন। রংপুর রামমোহনের বাড়ীতেই তিনি সাধন করিতেন। রামমোহন কলিকাতায় মাণিকতলায় বাসা করিলেন। রংপুরের ব্রহ্ম সভা মাণিকতলার বাসায় ১৮১৫ খৃঃএ "আত্মীয় সভা" নাম গ্রহণ করিল। যদি রংপুরের ব্রহ্ম-সভাকে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ স্মরণ করিতে দ্বিধা করেন, তবে 'আত্মীয় সভা'কে স্মরণ করিতে তাঁহাদের কি আপত্তি হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। এই আত্মীয়-সভায় ব্রাহ্মণ "শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন এবং গোবিন্দমালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন।" এই আত্মীয়-সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু রাজনারায়ণ সেন, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ আত্মীয়-সভাকেও স্মরণযোগ্য বিবেচনা করিলেন না।

রাজা রামমোহন রায় Adam সাহেবের,—যাঁহাকে গোঁড়া খৃষ্টানেরা Seco d Fallen Adam বলিত, Unit r'an Societyতে উপাসনা করিবার জন্য যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে যাইত তাঁহার পুত্রগণ, তাঁহার জ্ঞাতিরা, আর যাইতেন দুই শিষ্য—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। বলাই বাহুল্য যে, এই ভজনালয়ে খৃষ্টানের রীতি অনুসারে উপাসনা হইত।

একদিন খৃষ্টান ভজনালয় হইতে ফিরিবার পথে দুই শিষ্য গুরুকে বলিলেন, "আমরা বিদেশীদের উপাসনাস্থলে যাইব কেন? 'আমাদের নিজের একটি উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক'।"

রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তার পর যোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল; এবং ১৮২৮ খৃঃর ৬ই ভাদ্র উপাসনা-সভা সংস্থাপিত হইল।

এখানেও দেখিতে পাই, প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টার পর হইতে দুই ঘণ্টা সভা চলিত। "দুই জন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন।

পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে, সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত।" এখানেও ব্রাহ্মণে বেদ পাঠ করিত, আর গায়কে গান করিত; আত্মীয়-সভাতেও "শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন আর গোবিন্দ মালা ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিতেন।" আত্মীয় সভায় শ্লোক-ব্যাখ্যা হইত না, এখানে বেশীর ভাগ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শ্লোক-ব্যাখ্যা করিতেন। কাজেই কমললোচন বসুর বাড়ীর সভাকে যে কেন আত্মীয়-সভা বলা হয় নাই এবং তাহা হইতে ইহার পার্থক্য কি, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অথচ অনেক ব্রাহ্ম ৬ই ভাদ্রে মাঘোৎসবের মত ভাদ্রোৎসবও করেন। তবে ভাদ্রোৎসব মাঘোৎসবের মত তত জমে না। যদি মাণিকতলার এবং পরে সিমলা ষষ্ঠীতলার আত্মীয়-সভা আর কমললোচন বসুর বাড়ীর সভায় কোন পার্থক্য না থাকিল, তবে ব্রাহ্মগণ কমললোচন বসুর বাড়ীর সভা স্মরণ করিবেন, আর মাণিকতলার সভা বিস্মরণ হইবেন কেন? আকারে-প্রকারে এবং উদ্দেশ্যে যেখানে দুই সভাই এক, সেখানে স্মরণ করিতে হইলে কি পূর্ব্বগামীকেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য নয়? এ সমস্যার মীমাংসা কোথায়, এবং এ প্রশ্নেরই বা কে উত্তর দেয়? ব্রাহ্মদিগের এমন যে মুখর ইতিবৃত্ত, তাহাও এখানে নীরব।

১৮২৯ খৃঃ ৬ই জুন তারিখে দ্বারিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেওয়ান রামমোহন রায়ের বরাবরে একখানি দলিলে আছে—

—"ঐ চারি কাঠা অর্দ্ধ পুয়া জমি মায় এমারত মহাশয়দিগের নিকট চিরকাল ব্রাহ্ম-সমাজের নিমিত্তে মবলগে শিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুই শত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম।"

সুতানটি বা যোড়াসাঁকোর উপর এই ভূমি ও এমারত ছিল। ১১ই মাঘ হইতে এই নূতন গৃহে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। ইহা ব্যতীত ১১ই মাঘ আর কোন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দিবে না।

ব্রাহ্ম-মতবাদ ১১ই মাঘের পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল। ব্রহ্মোপাসকদিগের একটি সম্প্রদায়-গঠন—তাহাও,—যাহা হইবার, তাহা ১১ই মাঘের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের আকার-প্রকার, উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি কমললোচন বসুর বাড়ীতে যেমন ছিল, এই নূতন বাড়ীতেও ঠিক তেমনই রহিল। ১১ই মাঘ কেবল এই নূতন বাড়ীতে গৃহ-প্রবেশের দিন। আর সমস্ত ছাড়িয়া তাহাই কি এত স্মরণীয় হইল? ব্রাহ্ম-মতবাদের উদ্ভব কবে, ব্রাহ্মগণ তাহা দেখিলেন না; ব্রহ্মোপাসকগণ সম্প্রদায় গঠন কবে করিলেন, তাহাও তাঁহারা খুঁজিলেন না। খৃষ্টান ভজনালয় ছাড়িয়া যে দিন নিজেদের উপাসনা-সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে দিনও বিশেষ কিছু

নয়। যে দিন সেই উপাসনা-সভাকে ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে ৪২০০ টাকায় খরিদা বাড়ীতে তুলিয়া আনিলেন, সেই দিনটি ব্রাহ্ম-ইতিহাসে স্মরণীয় হইল। দেখা যাইতেছে, ১১ই মাঘের উৎসব শুধু একটা গৃহপ্রবেশের তারিখকে স্মরণ করা মাত্র। এই পৌত্তলিকতার দেশে ইহা এক অতি নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকতা। কিন্তু তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের আপত্তি ১১ই মাঘকে ব্রাহ্ম-ইতিহাসের প্রথম প্রবেশদ্বাররূপে প্রচার করায়, ইতিহাসের স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ ১১ই মাঘ উৎসব করুন, আনন্দ করুন, উত্তম কথা। কিন্তু যাহা ইতিহাস নয়, তাহাকে যেন ইতিহাস বলিয়া প্রচার না করেন, এই প্রার্থনা।

তার পরে প্রশ্ন—এই ১১ই মাঘ কোন্ বৎসরের? রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-লেখক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, ১৮২৯ খৃঃর ১১ই মাঘ; এবং তাঁহার পরবর্তী অন্যান্য আর সকলে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'—নীতি অনুসরণ করিয়া ১৮২৯ খৃঃকেই বাহাল রাখিয়াছেন। আমার পরলোকগত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকে ১৮২৯খৃঃর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ১৮২৯খৃঃর ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন, অনেকেই এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহাতে সন্দেহ করিতেছি। তাহার কারণ এই, ১৮২৯ খৃঃর ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম-সমাজ কমললোচন বসুর বাড়ীতেই ছিল। নূতন খরিদা বাড়ীতে উঠিয়া আসে নাই। ১৮২৯ খৃঃর ৬ই জুন (২৮শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে দলিল সম্পাদন করিয়া নূতন বাড়ী ক্রয় করা হয়। ৬ই জুনের পর হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে আর ১১ই মাঘ নাই। ১৮৩০খৃঃর প্রথম ভাগে যে ১১ই মাঘ আসে, এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া তাহাই প্রথম ১১ই মাঘ। যদি ১১ই মাঘেই এই নূতন বাড়ীতে প্রথম গৃহপ্রবেশের দিন হয়, এবং কমললোচন বসুর বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিয়া এই দিনে নূতন বাড়ীতে প্রথম সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চিতই ১৮৩০খৃঃর ১১ই মাঘ, ১৮২৯ খৃঃর ১১ই মাঘ নহে।

ব্রাহ্ম-ইতিবৃত্তের ব্রাহ্ম-লেখকগণ তাঁহাদের নিজেদের ঘটনার তারিখ ও তথ্য সম্বন্ধে এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের কথায় যে শুধু নির্ভর করা চলে না, তাহাই নহে, নির্ভর করা অতিশয় বিপজ্জনক।

ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টডিড্ যদিও রাজা রামমোহনের রচনা নহে, তথাপি ঐ ট্রষ্টডিড লেখা হওয়ার অব্যবহিত পরের যে ১১ই মাঘ, সেই ১১ই মাঘেই নূতন বাড়ীতে প্রথম সমাজের কার্য্য হয়; এবং সেই ১১ই মাঘকেই ব্রাহ্মগণ স্মরণ করিয়া উৎসব করেন। কিন্তু ট্রষ্টডিড্ লেখা হয় কোন্ বৎসরে? ট্রষ্টডিড্ই তাহার প্রমাণ। "This Indenture made the eighth day of January in the year

of Christ one thousand eight hundred and thirty etc"
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৮৩০খৃঃ ৮ই জানুয়ারী ট্রষ্টডিড্ লেখা হয়—এবং দুই তিন সপ্তাহ পরেই ১১ই মাঘ আসিয়া দেখা যায়। ট্রষ্টডিডের পরের প্রথম ১১ই মাঘই ব্রাহ্মগণ স্মরণ করেন। কিন্তু সে ১১ই মাঘ ১৮৩০ খৃঃএ। ১৮২৯খৃঃ ৬ই জুন নূতন বাড়ী খরিদ করা হয়। ১৮২৯খৃঃর ১১ই মাঘ কাজেই নূতন বাড়ী খরিদ করা হয় নাই। আর ১১ই মাঘ বৎসরে মাত্র একবার করিয়াই আসে। অতএব ১৮২৯ খৃঃর ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম-সমাজ কমললোচন বসুর বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু কমললোচন বসুর বাড়ীর ১১ই মাঘ ত কিছু স্মরণীয় নয়! অথচ ব্রাহ্ম-ইতিবৃত্ত-লেখকগণ ব্রাহ্ম-মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত-লেখকগণ ধারাবাহিকরূপে লিখিয়া আসিতেছেন, ১৮২৯খৃঃর ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য নূতন বাড়ীতে প্রথম আরম্ভ হয়।

সাহেব লোকেরা বিদেশী হইলেও, ব্রাহ্মদিগের ঘটনাগুলির তারিখ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম উদাসীন। নূতন বাড়ীতে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য যে দিন প্রথম আরম্ভ হয়, সে দিন একজন সাহেব লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নাম Mr. Montgomery Martin তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির একখানি ইতিহাস পুস্তক লেখেন। তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ তিনি দিয়াছেন। তিনি বলেন—

১) ১৮৩০খৃঃএ 'সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২) রামমোহন এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
৩) তিনি রামমোহনের সঙ্গে, সমাজ-প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত ছিলেন।
৪) আর কোন ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন না।
৫) পাঁচ শত হিন্দু উপস্থিত ছিল।
৬) ঐ সকল ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার দিন পাঁচ শত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। মণ্টোগোমারি সাহেব ব্রাহ্মণদিগকেই হিন্দু বলিয়াছেন।

মণ্টোগোমারি সাহেব একজন ঐতিহাসিক। তা ছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠার দিন রামমোহনের সঙ্গে নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইহা ১৮৩০ খৃঃর ঘটনা।

মিচেল্ সাহেব (J. Murray Mitchell. M. A. L. L D.) আর একজন ঐতিহাসিক। তিনিও বলেন, ১৮৩০ খৃঃর জানুয়ারী মাসে সাধারণ উপাসনার জন্য একটি গৃহ (hall) প্রতিষ্ঠা হয়। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের উক্তি হইতেও প্রমাণ হয় যে, ইহা ১৮৩০ খৃঃরই ঘটনা।

১৮৩০ খৃঃ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

আমরা দেখিতেছি, মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার জন্য কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক মিলিয়া একটা সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠা করিবার কথা রাজা ১৮০৯ খৃঃ হইতেই চিন্তা করিতেছেন। যে বৎসরের ১১ই মাঘকে ব্রাহ্মগণ স্মরণ করেন, ইহা তাহার ২২ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা; এবং কেবল মূর্ত্তিপূজার পরিহার রাজা যে বৎসর চিন্তা করেন, তাহা এই ১১ই মাঘের ঠিক ৪০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

রংপুরের ব্রহ্ম-সভায় দেখিতে পাই—

ক) মূর্ত্তি পূজা পরিহার।

খ) নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে আলোচনা।

গ) এই ব্রহ্মজ্ঞানকে বৈদান্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

ঘ) এই ব্রহ্ম-সভায় জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল মানুষেরই প্রবেশ-অধিকার।

রংপুরের ব্রহ্ম-সভার ২২ বৎসর পরে, ১৮৩০ খৃঃর ট্রষ্টডিডেও দেখিতে পাই—

—১) মূর্ত্তি-পূজা পরিহার।

—২) নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা।

—৩) জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার।

রাজার 'তুহফাতুল মওয়াহেদ্দিন' গ্রন্থের মতবাদের সহিত, ট্রষ্টডিডের মতবাদের বিশেষ ঐক্য আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই এই ট্রষ্টডিড্ রাজার নিজের রচনা না হইলেও, তাঁহারই দ্বারা যে অনুপ্রাণিত, ইহা অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, বৈদান্তিক ভিত্তির উপর নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ট্রষ্টডিডে না থাকিলেও, পরবর্ত্তী "আত্মীয়-সভা" ও "ব্রহ্ম সভা"র উপাসনা-পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে বৈদান্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং কি ট্রষ্টডিডের দিক্ দিয়া, কি "আত্মীয়-সভা" ও যোড়াসাঁকোর কি কমল বসু, কি কালীপ্রসাদ করের বাড়ীর "ব্রহ্ম-সভার" দিক্ দিয়া, রংপুরের 'ব্রহ্ম-সভাই" আদি এবং আদর্শ। অথচ রংপুরের ব্রহ্ম-সভার ইতিবৃত্ত যে কেবল আলোচনা হয় নাই, তাহা নহে;—১১ই মাঘে উৎসব করিয়া সেই ইতিবৃত্তকে যেন মুছিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্তের একটি গুরুতর অপকারসাধন করা হইয়াছে।

রংপুরের ব্রহ্ম-সভা হইতে ২২ বৎসর পর ব্রহ্ম-সমাজ ১১ই মাঘে নূতন কি করিয়াছেন?

—১) ঘরের পাশে লাল পর্দ্দা দিয়া শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ করা হইয়াছে।

—২) ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া আনিয়া যথেষ্ট অর্থ উৎকোচ দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য "আত্মীয়-সভাতেও" বেদ পর্দ্দানশিন ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা প্রচুর অর্থ পাইতেন।

কলিকাতার 'আত্মীয়-সভা' ও 'ব্রহ্ম-সভার' এই দুইটি বিশেষত্ব রংপুরের ব্রহ্ম-সভায় ছিল না।

রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদকে পর্দ্দানশিন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দেওয়ার পক্ষেও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে এই দুইটি কুকর্ম্ম (?) 'আত্মীয়-সভা' ও 'ব্রহ্ম-সভায়' প্রশ্রয় পাইল কিরূপে? এবং ইহা ট্রষ্টডিডেরও বিরোধী অনুষ্ঠান। রামমোহন যাহা লিখিলেন, :অনুষ্ঠানে তাহা করিলেন না। তাঁহার কথা আর কার্য্যে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? তিনি কি ভয় পাইলেন? তাহা কি সম্ভব? মূর্ত্তিপূজাকে যিনি অস্বীকার করিলেন, সতীদাহ যিনি নিবারণ করাইলেন, মদ্যপান, শৈববিবাহ প্রভৃতি যিনি অসঙ্কোচে প্রকাশ্যে সমর্থন করিলেন, মতের স্বাধীনতার জন্য যিনি অতি বাল্যকালে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া সমগ্র দেশে সিংহের মত বিচরণ করিয়া গেলেন, সেই রামমোহন ভয় পাইয়া, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে, নিজের প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে, বেদকে পর্দ্দানশিন করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিলেন, ইহা বস্তুতঃই এক সমস্যা। ইতিহাসে স্মরণীয় চরিত্রগুলি যে কত জটিল, কত দুরূহ, তাহা অতি সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়।

'আত্মীয়-সভায়' ও 'ব্রহ্ম-সভায়' উপাসনার সময় সঙ্গীত হইত। রংপুরের ব্রহ্ম-সভায় সঙ্গীত হইত কি না, জানিতে পারি নাই। উপাসনার সময় এই সঙ্গীতের প্রচলন নির্ব্বিবাদে হয় নাই। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ শঙ্কর শাস্ত্রী ইহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। রামমোহনকে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির দোহাই দিয়া তবে ব্রহ্মোপাসনার সময় সঙ্গীতের প্রচলন করিতে হইয়াছিল। আজ যাহা এত সহজ মনে হয়, সে দিন তাহা এত সহজ ছিল না।

রাজা রামমোহন ১৮৩০ খৃঃর ১৫ই নভেম্বর বিলাতযাত্রা করেন। দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম-সমাজ-প্রতিষ্ঠার বৎসরেই তিনি বিলাতযাত্রা করেন। আর দেবেন্দ্রনাথের উক্তিও এই কথার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। যাহা হউক, ব্রহ্ম-সভায় যে সমস্ত গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ যোগ দিতেন, তাঁহারা কোন দিনই একেবারে নিরাকার-বাদী হইয়া উঠেন নাই। তাঁহারা বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সমস্তই করিতেন। বেশীর ভাগ রামমোহনের দলে থাকিয়া ব্রহ্ম-সমাজে গিয়া উপাসনাটাও সপ্তাহান্তে করিয়া আসিতেন। রাধাকান্তের ধর্ম্ম-সভা, ব্রহ্ম-সভার সভ্যদিগকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্ম-সভা ও ধর্ম্ম-সভায় দলাদলি হইত।

ইহা গেল ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, ব্রহ্ম-সমাজ বা সভার মূল ত: কি ইহার বিশেষত্ব কি? ইহার মৌলিকত্বই বা কি? এবং দেশের পক্ষে ন ইহার উপযোগিতাই বা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম,—ব্রহ্ম-সভা বা সমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। দ্বিতীয়—ব্রহ্ম-সমাজের ট্রষ্ট-ডিড্।

ব্রহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে দেখা গেল,—

১) ব্রহ্ম-সভায় বেদের খুব মান্য।

২) বেদে ব্রাহ্মণের অধিকার, শূদ্রের অধিকার নাই।

ইহা অপেক্ষা বেদের আর কি মান্য হইতে পারে?

কিন্তু রামমোহন-শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব নাকি ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কোন বন্ধু নাকি তাহা শুনিয়াছিলেন। কোন্ বন্ধু, তাঁহার নাম নগেন্দ্র বাবু কেন যে গোপন করিলেন, তাহা বুঝা শক্ত। এই রকম বিষয়ে নাম-গোপনের মত গর্হিত কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এইরূপ কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে পারি না। আর এ ক্ষেত্রে ত নহেই। কেননা, স্বদেশী বিদেশী বহু ঐতিহাসিকের চাক্ষুষ প্রমাণ ইহায় সাক্ষ্য দিতেছে। তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ নিজে পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে দীক্ষা লইবার সময়, ব্রহ্ম-সভায় বেদকে পর্দ্দানশিন দেখিয়াছেন। আমার পরলোকগত বন্ধু অজিত বাবু বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথই বেদকে পর্দ্দার বাহিরে আনেন। ব্রহ্ম-সমাজে ইহা একটা দেবেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি।

অন্যদিকে ব্রহ্ম-সমাজের ট্রষ্টডিডে দেখা যায়,—

১) ব্রহ্ম-সভায় উপাসকদের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকিতে পারিবে না।

২) আর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, সেইমত বক্তৃতা, উপদেশ ও উপাসনা ব্রহ্ম-সভায় করিতে হইবে।

ট্রষ্টডিডের এই দ্বিতীয় অনুশাসনটি প্রথম অনুশাসনটির সহিত অনুস্যূত। ট্রষ্ট-ডিডে দেখা যায়—বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে সাধারণ ভূমি বর্ত্তমান, তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে নিরাকার পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম-সভায় আসিয়া উপাসনা করিবেন। ঈশ্বরের কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা হইতে পারিবে না। ঈশ্বরকে কোন বিশেষ নামে ডাকা হইবে না। উপাসকদের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকিবে না।

পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম-সভার অনুষ্ঠানে দেখা যায়,—হিন্দু-জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই এখানে এক-মাত্র অবলম্বন। বেদ-বেদান্তের পরব্রহ্মকেই উপাসনা করা হয়। উপাসকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করা হয়।

সুতরাং ট্রষ্ট-ডিডে আর অনুষ্ঠানে ঐক্য ত নাই-ই, অতিশয় মর্ম্মান্তিক বিরোধ।

যাঁহারা ট্রষ্টডিড্‌কে অনুসরণ করিয়া বলিবেন যে, সকল ধর্ম্মের লোকের জন্ত একটা 'সার্ব্বভৌমিক উপাসনা' ও সেই উপাসনার জন্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্ম-সভায়, তথা রামমোহনের বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব, এবং এ যুগের পক্ষে তাহা একান্ত উপযোগী, এদেশের পক্ষে তাহা একান্ত আবশ্যক, তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া নিশ্চয়ই আর এক দল বলিবেন, ট্রষ্টডিডে যাহাই থাক, ব্রহ্ম-সভার অনুষ্ঠানে সার্ব্বভৌমিকতা কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। উপাসকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে মর্ম্মান্তিক ভেদ ;—যাহা এ যুগের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী, এ দেশের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূল।

এ সমস্যার মীমাংসা কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর কি ?

যাহা হউক, ব্রহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন বিলাত চলিয়া গেলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সেই দূর-বিদেশেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইল।

রামমোহন বিলাত গেলে পর আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একাকী ব্রহ্ম--সভা চালাইতে লাগিলেন। আর যে সমস্ত বিষয়ী লোক রামমোহনের খাতিরে ব্রহ্ম সভায় যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন দিনই সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং দোল-দুর্গোৎসব কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। রামমোহন চলিয়া গেলে, তাঁহারা সপ্তাহান্তে নিরাকারের উপাসনাই পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু দোল-দুর্গোৎসব যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিল। এ অবস্থায় ব্রহ্ম-সভা যায় যায়। ১০।১২ জন লোকও ব্রহ্ম-সভার সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত হইত না। যাহারা আসিত, তাহাদের মধ্যে আবার কাহারও মাথায় বাজারের ধামা এবং কাহারও হাতে টিয়া পাখী!

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-সভায় যোগ দিয়া এই সমস্ত দেখিলেন।

রামমোহন বিলাত চলিয়া গেলেন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-সভায় যোগ দিলেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে। এই ১২ বৎসর আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্তে ব্রহ্ম-সভার মতের ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য।

দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য হইতেই দেখা যায় যে, অনুষ্ঠান-পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেন না, "সূর্য্যাস্তের পরে সমাজের পাশের ঘরে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেন, **সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ।** সূর্য্যাস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজগৃহে প্রকাশ্যে বেদী গ্রহণ করিয়া বসিতেন। সমাজে লোক বেশী হইত না ; বড় জোর দশ বারো জন লোক হইত।"

আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সময় ব্রহ্ম-সভার ধর্ম্মকে "বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করা হইত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-সভার মতের দিক্‌ হইতে দেখিলেন যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়—

১) ব্রহ্ম-সভার পক্ষ হইতে বেদকে অপৌরুষেয় ও আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করেন।

২) "পরমেশ্বরের উপাসনা অধিকারিভেদে চারি প্রকারে বিহিত হয়। তন্মধ্যে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য জীবাত্মা-পরমাত্মার যে অভেদচিন্তন, ইহা মুখ্য উপাসনা হয়," ব্রহ্ম-সভার ইহাই ধর্ম্মমত ও উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উপদেশ দেন।

৩) এমন কি, ঈশ্বর ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতারবাদ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বক্তৃতা দিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহাও একদিন গিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া আসিলেন।

রামমোহন হইতে ব্রহ্ম-সভা কি মতবাদবিষয়ে বিদ্যাবাগীশের হস্তে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ভিন্নদিকে প্রস্থান করিতেছিল?

রামমোহন কি—(১) বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না? (২) তিনি কি শাঙ্কর বেদান্তকে অবলম্বন করেন নাই? (৩) অবতারবাদের কোন রকম সমর্থন-যোগ্য ব্যাখ্যা কি তিনি দিয়া যান নাই?

আমার বিশ্বাস, উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়েরই সমর্থন রামমোহনের লেখার মধ্যে পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাওয়া যায়। পৌরাণিক অবতারবাদ অস্বীকার করিলেও, বৈদান্তিক অবতারবাদ তিনি স্বীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এ কথা কিরূপে সাহস করিয়া বলা যায় যে, আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রামমোহনের ব্রহ্ম-সভাকে রামমোহন-নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিদ্যা-বাগীশ মহাশয় রামমোহনকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার উত্তর অথবা আমার প্রশ্ন এই—কে পারিয়াছে? দেবেন্দ্রনাথ কি রামমোহনকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন? অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র—ইঁহারা কি রামমোহনকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন? আর অপরের ত কথাই নাই।

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্তে ব্রহ্মসভা ট্রষ্টডিডের আদর্শ হইতে আরও দূরে সরিয়া গেল। ইহা আমিও দেখিয়াছি এবং ইহা সত্য। কিন্তু ইহার জন্য কে দায়ী? যদি ব্রহ্ম-সভার অনুষ্ঠান বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্তে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার দিকে না আসিয়া ক্রমশঃ ট্রষ্টডিডের আদর্শানুযায়ী সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইত, তবে কি এ কথা বলা যাইত না যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, রামমোহন হইতেঃ ভিন্ন পথে ব্রহ্ম-সভাকে চালিত করিয়াছেন? তিনি একটা বস্তুতত্ত্বহীন কাল্পনিক

সার্ব্বভৌমিক আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ব্রহ্ম-সভার জাতীয় ভাব নষ্ট করিয়াছেন, এবং রামমোহন তাহা করেন নাই?

কথা এই, ট্রষ্টডিডে ও অনুষ্ঠানে যে অসামঞ্জস্য রামমোহন ব্রহ্ম-সভার উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, কেহই তাহার সমন্বয় করিতে পারেন নাই; এবং তাহার সমন্বয়সাধন সম্ভবপর কি না, তাহার সমাধান করাও সুকঠিন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে ক্রমাগত ৫০ বৎসর একবার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, একবার সকল ধর্ম্মের বস্তুতন্ত্রহীন সার্ব্বভৌমিকতা এই দুয়ের মধ্যে দোল খাইয়াছেন। বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ইহাঁরা হিন্দুর সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে ব্রহ্ম-সভাকে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতিক্রিয়ার ফলে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার, কেশবচন্দ্র, ট্রষ্টডিড্ উল্লিখিত সার্ব্বভৌমিকতার দিকে ছুটিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ব্রাহ্ম-ইতিহাসকে এই দিক্ হইতে দর্শন করিলে, ইহার একটা সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অন্যথা নহে। সুতরাং যে দোষে সকল ব্রাহ্ম নেতাই দোষী, তাহা কেবল এক আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে যাঁহারা উদ্যত, আমি তাঁহাদের একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-সভায় আসিয়া যোগ দিলেন, এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ তিনি আরও ২০ জন বন্ধুর সহিত আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রহ্ম-সভার বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার সময় আচার্য্যকে বলিলেন—"যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।" অক্ষয়কুমার দত্তও এই সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। যেমন তান্ত্রিক সাধনায় রামমোহনের দীক্ষাগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, তেমনি ব্রহ্মসভার বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মের সাধনায় দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের দীক্ষাগুরু—আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। শাক্ত-বেদান্তে আর ব্রহ্ম-সভার বেদান্তে যে সাদৃশ্য তাহা বিশেষ রূপে অদ্বৈতমতের সাদৃশ্য। তবে তান্ত্রিক সাধনায় আর ব্রহ্ম-সভার বেদান্ত-সাধনায় পার্থক্য বিস্তর। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও তিনি অগ্রজের মত তান্ত্রিক বামাচারী সাধক ছিলেন না, এবং সন্ন্যাসীও ছিলেন না। রামমোহন ছিলেন তান্ত্রিক গুরুর তান্ত্রিক শিষ্য। তাহাও আবার যে সে তান্ত্রিক নয়? বামাচারী তান্ত্রিক। মন্ত্র, যন্ত্র, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনায় আনুসঙ্গিক অনেক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। বামাচারী তান্ত্রিকদের আবার শাস্ত্রমত চক্রের সাধনায় শক্তির আবশ্যক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রহ্ম-সভায় এ সব ছিল না, কেবল আত্মা পরমাত্মার অভেদচিন্তা করিলেই মুখ্য সাধন হইয়া যাইত। সুতরাং রামচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষাগ্রহণকালে দেবেন্দ্রনাথকে কোন গুপ্ত মন্ত্র ও গুপ্ত সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয় নাই। তাঁহার সাধনা দিবালোকের মত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট ছিল। দেবেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাধক-জীবনে—কি গৃহে, কি সমাজে, তাহা চিরদিনই অনাবৃত, অকুণ্ঠিত ও মুক্ত ছিল। দীক্ষাগ্রহণের পরে ব্রহ্ম-সভাকে দেবেন্দ্রনাথ কিরূপে পরিচালিত করিলেন, তাহা এক ইতিহাস, সুতরাং তাহা ত আমাদের দেখিতে হই-বেই। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ কোনরূপ ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছি-লেন কি না, সংক্ষেপে তাহাও আমাদের দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

কেরাণী

১

উচ্চহাস্যে সতীশ বলিল, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, ভাই! বর্ণনা করিতে বসিলে আর জ্ঞান থাকে না। শেষে অতিরঞ্জনের ছাপে আসল সত্যটুকু কোথায় লুপ্ত হয়, আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

অবিনাশ এমন ভাবে টেবিলের উপর আঘাত করিল যে, তাহার হাত লাগিয়া চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি সেটাকে ধরিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে সে বলিল, "এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই। তোমরা লক্ষপতি, সুখী মানুষ, গরীব কেরাণীর দুঃখ বুঝিবার অবকাশ ও সুযোগ তোমাদের কোথায়? আর প্রয়োজনই বা কি? তোমাদের এ বিষয়ে ত অভিজ্ঞতা নাই, শুধু কেতাব আর সংবাদপত্র পড়িয়া সব দুঃখটুকু কি অনুমান করা যায়?"

"তা ভাই, যাই বল না কেন, হইতে পারে, অর্থের অভাব কেরাণী-জীবনে না ঘুচিতে পারে, আর রোজ রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপিস যাওয়ার কষ্ট আছে, সে ত সকলেরই আছে, সময়মত সকলকেই কাজ করিতে হয়, কিন্তু তুমি যে সব কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথা বলিতেছ, তাহা সত্য হইলে এ পথে কি কেহ যাইত? শুনিয়াছি, টাকা জমা দিয়াও অনেকে কেরাণীগিরির চাকরীও লয়।"

নরেন্দ্র এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া চা পান করিতেছিল। সে বলিল, "না ভাই সতীশ, তুমি একটা ভুল করিতেছ, অবিনাশের বর্ণনা অতিরঞ্জন নহে। অবশ্য, আমাকে কেরাণীগিরির ঘানিতে এখনও কাঁধ দিতে হয় নাই বটে, তবে আমি জানি, এমন কষ্ট, এমন লাঞ্ছনা আর কোন কাজে নাই।"

"কষ্ট? লাঞ্ছনা?—এই দুনিয়ায় এমন অভিশপ্ত জীব আর নাই। বাঙ্গালাদেশের কেরাণী কুকুর-বিড়ালের অপেক্ষাও অধম জীব। অথচ শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের যে অংশ এইরূপে পিষ্ট হইয়া দিন দিন মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ নহে।"

নরেন্দ্র নিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল, "কয়েকজন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ছাড়া আর সবই ত হতভাগ্য কেরাণী।"

উন্মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের রাজপথের দিকে চাহিয়া সতীশচন্দ্র বলিল, "এতই

যদি কষ্ট, এমনই যদি জঘন্য, তবে এ পথে সাধ করিয়া বাঙ্গালী যায় কেন? লাঙ্গল ধরাও যে ইহার অপেক্ষা ভাল।"

অবিনাশ এবার অনুশোচনার স্বরে বলিল, "পোড়া পেটের দায়ে ভাই। তা ছাড়া আরামপ্রিয়, উদ্যমহীন বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস ও বিজলী-বাতির কুহকে মুগ্ধ হইয়া আপাতরম্য কেরাণীখানায় প্রবেশ করে।"

সতীশ ভৃত্যকে ডাকিল, "টিনিবাস, আমাদের জন্য বাড়ীর ভিতর থেকে আরও কিছু খাবার নিয়ে আয়।"

পান-ভোজন শেষ হইলে সতীশচন্দ্র বলিল, "যাক্, ভাবিবার জন্য একটা নূতন বিষয় পাওয়া গেল। এ বিষয়টা কখনও আলোচনা করিয়া দেখি নাই।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবে না কি?"

"না, সে ত হয়ে গেছে। বড় ভুল করেছি। অবিনাশ আগে যদি বলিত, তবে সত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেরাণীতত্ত্ব নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিতাম।"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠাট্টা-তামাসা নয়। কেতাবী বিদ্যায় এ সকল বিষয়ের আলোচনা চলে না। দস্তুরমত কেরাণীগিরি করিয়া অভিজ্ঞতা জন্মিলে তবে লেখা যায়!"

নরেন্দ্র ও সতীশ হাসিতে লাগিল।

২

সতীশচন্দ্রের মাথায় খেয়াল চাপিল; সে একবার কেরাণীগিরির বহরটা যাচাই করিয়া দেখিবে। কিন্তু পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহাকে কেহই এ কার্য্য করিতে দিবেন না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ধনকুবের পিতার সন্তান, অভিজাতবংশে তাহার জন্ম। সামান্য কেরাণীগিরি করিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। পিতা রাধাগোবিন্দ মিত্র রাজসরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, রায় বাহাদুর খেতাব ত আছেই। অনেক বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রতা। জ্যেষ্ঠ সহোদর-যুগল বিলাত-ফেরত—একজন সিভিলিয়ান্, অপরটি ডাক্তার। রাজসরকারে উভয়েই নিযুক্ত। কলিকাতা সহরে তাঁহাদের ধনগৌরব ত আছেই; মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। এ অবস্থায় সে যদি সামান্য চাকরী করিতে যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের মাথা হেঁট হইবে। কিন্তু খেয়ালটা মিটাইতে না পারিলেও ত তাহার মন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। বাল্য-কাল হইতেই সে অত্যন্ত জেদী ও খেয়ালী। পিতা-মাতার কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া অসম্ভব

আদরে সে বাল্যকালে লেখাপড়ায় অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। খেলাধুলা ও দুষ্টামি করিয়াই সে বহুদিন কাটাইয়া দিয়াছিল। শেষে তাহার পিতা যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং পরিণামে তাহাকে কোনও কারবারে ঢুকাইয়া দিবার জন্য জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই সতীশ জেদ করিয়া বলিল যে, সে এখন ব্যবসায়ে যাইবে না। তদবধি সে অখণ্ড মনোযোগের সহিত লেখাপড়ায় মন দিয়াছিল। প্রকৃতিদত্ত মেধাবলে সে যে শুধু একটির পর আর একটি পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে, প্রত্যেক পরীক্ষায় যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

বিজ্ঞানে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার পর সকলেই তাহাকে বিলাতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু খেয়ালী সতীশ সে দিক্ দিয়া যায় নাই। সে বি, এল পরীক্ষার সঙ্গে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। বিলাত যাওয়ার প্রসঙ্গে সে এক অদ্ভুত মত বাহির করিয়াছিল। তাহার ধারণা, অনেক বাঙ্গালী বিলাতে গিয়া ঠিক মানুষরূপে ফিরিয়া আসে না—আর একটা কিছু হয়।

রাধাগোবিন্দ মিত্র পিতৃপুরুষের ধর্ম্মমত ত্যাগ না করিয়াও প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। গৃহে পৈতৃক শ্যামরায়ের বিগ্রহ ছিল, যথারীতি পূজাপাঠও হইত। সে সকল বিষয় তিনি বন্ধ করেন নাই বটে, তবে নিজে তাহাতে বড় যোগ দিতেন না। পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলকেই অল্প-বিস্তর পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু খেয়ালী সতীশচন্দ্রকে তিনি কোনমতে বাগে আনিতে পারেন নাই। তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইত, সে সর্ব্বাগ্রে সেইটাই করিয়া বসিত। কোনও মতেই কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

কোনও সম্ভ্রান্ত, অভিজাত বংশের বিদুষী কন্যার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কন্যার পিতাও রাধাগোবিন্দ বাবুর ন্যায় কুসংস্কারবর্জ্জিত। বালীগঞ্জের নিকটেই তাঁহাদের বাড়ী। কন্যা তখনও নাকি কলেজে পড়িতেছিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেরই এ বিবাহে আগ্রহ ছিল। কন্যাপক্ষও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রটিকে কবলিত করিবার জন্য বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু যে বিবাহ করিবে, তাহাকে কেহই রাজি করাইতে পারে নাই। সতীশচন্দ্র তাহার মাতাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষার ফল বাহির হইলেও সে বিবাহ করিবে না। এম্ এল্ পরীক্ষা দিয়া, পড়া শেষ করিয়া সে যখন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবে, তখন বিবাহের কথা চলিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

এহেন খেয়ালী সতীশচন্দ্র যখন মনে মনে সংকল্প করিয়া বসিল যে, সে কেরাণী

গিরি করিবে, তখন সে আর কোনও মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। পিতৃবন্ধু ডোনাল্ড সাহেবের নিকট একদিন সে হাজির হইল। ডোনাল্ড সাহেব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তিনি তাহাকে বিশেষরূপ চিনিতেন এবং তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাহাকে অত্যন্ত স্নেহও করিতেন।

করমর্দ্দন করিয়া সাহেব তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। সতীশ-চন্দ্র সপ্রতিভভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

"তুমি চাকরী করিবে? বল কি?"

"হাঁা সাহেব, কোন একটা আপিসে যদি চাকরী করিয়া দাও, বড় ভাল হয়। ছোট খাট যাহাই হউক না কেন, আমার একটা চাকরী চাই।"

"ডেপুটি হইতে চাও?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "হাকিমী আমি করিতে পারিব না সাহেব! সে সব চাকরীর জন্য আমি আসি নাই। কোন আপিসে একটা কেরাণীগিরি চাকরী আমি চাই।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কেরাণীগিরির জন্য এত সখ হইল কেন? তোমার বাবা মত দিবেন? এ অদ্ভুত খেয়াল হইল কেন?"

"বাবা কি দাদারা জানিতে পারিলে হইবে না। আমি কাহাকেও না জানাইয়া কাজ করিতে চাই। কথাটা খোলসা করিয়া বলি, শুনুন। আমি কেরাণীগিরি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব, তাই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাই।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ ত বড়ই অদ্ভুত প্রস্তাব! এমন কথা কোন বাঙ্গালীর মুখে আমি এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।—আচ্ছা, আমি তোমাকে একখানা পত্র দিতেছি। আমার জামাই ডিকেন্স সাহেব সেখানকার কর্ত্তা। তিনি এই মাসেই ছুটি লইয়া বিলাতে চলিয়া যাইবেন। সে আপিসে বোধ হয় কোন কাজ খালি থাকিতে পারে। এই আপিসের বড় কর্ত্তা ম্যাকফারসন্ সাহেবকে চেন ত? হাঁা, তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে। তিনি এখন সিমলার পাহাড়ে আছেন। তাঁর কাছেও আমি তোমার জন্য পত্র লিখিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "না সাহেব, তাঁকে জানাবেন না। আমি সকলের অজ্ঞাতসারে কাজ করিতে চাই। আমি যে এম, এস্, সি, পাশ করিয়াছি, আপনার জামাতার নিকট সে কথা লিখিবেন না।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বড় রহস্যময় হইয়া উঠিতেছ। আচ্ছা, তোমার কথামত আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি। কিন্তু কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তুমি কি প্রবন্ধ লেখ, তাহা একবার আমাকে পড়িতে দিও।"

৩

তাহার চাকরী জুটিয়াছিল। জনৈক বৃদ্ধ কেরাণী অবসর গ্রহণ করায় ক্রমে ক্রমে প্রমোসন দিয়া নিম্নপদেনূতন লোক লইবার কথা ছিল। ডিকেন্স সাহেব শ্বশুরের প্রেরিত যুবকটিকে সেই পদে বহাল করিলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। আপিসের বড়বাবুর অন্যতম শ্যালক সেই পদের প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে সাহেব হেড্-ক্লার্কের এ অনুরোধটি এবার রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সাহেবের পরিচিত লোক বলিয়া আপিসের বড়বাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও, সতীশচন্দ্রকে নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। বড়বাবুরূপ জীবের সহিত যাঁহাদের কোনও কালে পরিচয় ঘটে নাই, তাঁহাদের সাধ্য নাই, এই অপূর্ব্ব প্রাণীর স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। সুতরাং সতীশচন্দ্র প্রথমতঃ বড়বাবুর মুখোসপরা মুখখানিই দেখিতে পাইল। তাঁহার আসল মূর্ত্তিটি তখন প্রকাশ পাইল না।

প্রত্যহ দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার একটা কারণ আবিষ্কার না করিতে পারিলে সতীশচন্দ্র ধরা পড়িয়া যাইবে, এজন্য সে বাড়ীতে জানাইয়া রাখিল, প্রত্যহ সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়িতে যাইতেছে। বাড়ীর জুড়ি অথবা মোটর লইয়া সে কোনও দিন বাহির হইত না—পাছে সোফার অথবা কোচম্যান তাহার গন্তব্য স্থানের প্রকাশ করিয়া ফেলে। সাধারণ পরিচ্ছদে সে ট্রামে চড়িয়াই আপিসে যাইত। ঘুণাক্ষরেও সে কোনও দিন বন্ধুবান্ধববর্গের কাহারও নিকট চাকরীর কথা প্রকাশ করিল না। নূতন জীবনের অভিজ্ঞতালাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছদ্ম অভিনয়ের অন্তরালে কৌতুকের উৎস লুক্কায়িত আছে মনে করিতেই তাহার চিত্ত পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে আনিতে পারে নাই। স্বেচ্ছায় এখন সে সেই নিয়মের শৃঙ্খলে আপনাকে ধরা দিয়াছিল।

আপিসের কেহই জানিত না যে, সতীশচন্দ্র মিত্র রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়াছে; সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার পিতার বহু লক্ষ মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ আছে, এ কথাও সে প্রকাশ করে নাই। অন্যান্য কেরাণী এবং আপিসের বড়বাবু ও সাহেব পর্য্যন্ত জানিতেন, সে দরিদ্র-সন্তান, পেটের দায়েই চাকরী করিতে আসিয়াছে। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কেরাণীরাও তাহার উপর মুরুব্বীয়ানা প্রকাশ করিত। সে মনে মনে হাসিত এবং একমনে নিজের কাজ করিয়া যাইত। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সে আপিসে হাজির হইত। নিজের

কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে বিশেষ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিত, অন্য কেরাণীবাবুরা কে কি করেন।

ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন তাহার নিকট অতিতুচ্ছ। প্রতিমাসেই হাতখরচের জন্য তাহার পিতা তাহাকে একশত করিয়া টাকা দিতেন। তাহা ছাড়া স্কলার-শিপের টাকাও ছিল। প্রয়োজন হইলে, চাহিবামাত্রই পিতার নিকট হইতে সে যথেষ্ট অর্থ পাইত। সুতরাং প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া সে আপিসের মধ্যেই কেরাণীদিগকে খাওয়াইয়া দিল। তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল; কিন্তু সে যখন গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিল, দুনিয়াতে সে একা, দ্বিতীয় আত্মীয় কেহ নাই, তখন সহানুভূতিতে সকলের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল।

৪

পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি তাহাদের আপিস। ট্রাম হইতে নামিয়া প্রত্যহই সতীশকে খানিকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হইত। আপিসের গেটের কাছে আসিলেই সে একখানি জুড়ি ও তাহার মধ্যস্থ একমাত্র ষোড়শী যাত্রীকে প্রায়ই সেখান দিয়া যাইতে দেখিত। কোনও দিন গেটের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় দেখা হইত; কোনও দিন আপিসের বাহিরে, পথেই দেখা মিলিত। সতীশ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, মেয়েটি কোনও স্কুল অথবা কলেজের ছাত্রী। কারণ, তাহার সম্মুখস্থ আসনে বই এবং খাতাপত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রত্যহ প্রায় একই সময়ে একই স্থলে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিতে থাকায় সতীশের মনে একটা কৌতুক জাগিয়া উঠিল। ব্যাপারটা ঠিক যেন উপন্যাসেরই মত কৌতূহলোদ্দীপক। সতীশ এই নবীনা, অপরিচিতার মুখ-চক্ষুর ভঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে, সে সামান্য কেরাণী, চাকরীর জন্য আপিসে যাইতেছে, এ কথাটি যেন অপরিচিতা বুঝিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যহ গাড়ীখানি তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার সময় সে অভ্যাসবশে সেই দিকে চাহিত। দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র নবীনা উপেক্ষাভরেই মুখ ফিরাইয়া লইত। আবার পরদিবস ঠিক এই অভিনয়ই চলিত।

পূর্ব্বে খুব সাধারণ পরিচ্ছদেই সতীশ আপিসে আসিত। কিন্তু একদিন সহসা তাহার মনে কি খেয়াল চাপিল। সে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া অঙ্গুলিতে হীরাকাঙ্গুরীয় এবং সোনার রিষ্টওয়াচ ধারণ করিয়া আপিসে চলিল। সে বুঝিল, তাহার বেশের পরিবর্ত্তন নবীনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আপিসের সকলেই তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। সে যেরূপ জামা, কাপড় ও জুতা পরিয়া আসিয়াছিল, আপিসের কাহারও তত বেশী দামের বেশ-ভূষা করিবার সামর্থ্য ছিল না।

পরদিবস সে আবার নূতন প্রকার পরিচ্ছদ পরিয়া আসিল। সতীশ দেখিল, নবীনা ছাত্রীটি তাহার বেশবিন্যাসের পারিপাট্য কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। আপিসের মধ্যেও তাহার এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে একটা আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছিল।

ডিকেন্স সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে যে তন সাহেব আসিয়াছিলেন, সতীশচন্দ্রের কথা তিনি কিছুই জানিতেন না। বড়বাবু এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের গ্রাস যে ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে কোনও বড়বাবু মার্জ্জনা করিতে পারেন না। তবে কাজকর্ম্মে সতীশের কোনও গলদ বাহির হয় নাই। নিয়মিত সময় আপিসে আসা ও যাওয়ার প্রতি তাহার লক্ষ্যও ছিল; কাজেই তিনি তাহাকে কায়দা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ডিকেন্স সাহেবের আনীত লোক সে, কাজেই বড়বাবু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। নূতন সাহেব আসিলে অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিল না। সতীশচন্দ্র যখন বিলাসী বাবুর ন্যায় প্রত্যহ নব নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপিসে আসিতে লাগিল, তখন বড়বাবুর আর ধৈর্য্যধারণের সীমা রহিল না। একদিন তিনি সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, এটা থিয়েটার নয়।"

সতীশ প্রকৃতই জানিত না যে, তাহার উপর বড়বাবুর মর্ম্মান্তিক আক্রোশ আছে। সে সবিস্ময়ে বিনীতভাবে বলিল, "আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মুরুব্বীয়ানা চালে চেয়ারে হেলান দিয়া গম্ভীরভাবে বড়বাবু বলিলেন, "সোজা কথাটা বুঝিতে পারিলে না? আপিস থিয়েটারও নয়, শ্বশুরবাড়ীও নয়, এখানে অত বাহার করিয়া আসা ভাল নয়। এত টাকা তুমি কোথায় পাও?"

সতীশের মনটা সে দিন খুবই প্রসন্ন ছিল, কারণ, পূর্ব্বদিবসে সে সংবাদ পাইয়াছিল যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তি এবার সেই পাইয়াছে। সুতরাং বড়বাবুর তিক্ত অপ্রীতিকর মন্তব্য তাহার চিত্তে প্রথমতঃ তেমন আঘাত করিল না। সে বলিল, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, ইহা আমার জানা ছিল না। সুতরাং আপনার মন্তব্যের হেতু আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

বিদ্রূপভরে বড়বাবু বলিলেন, "ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরাণীর এত বাবুয়ানা কেন? সাহেবের কানে গেলে অনর্থ হইবে, তাহা বলিয়া রাখিলাম।"

সতীশের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। দুই মাস সে এখানে কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে বড়বাবু অন্যান্য কেরাণীর প্রতি প্রায়ই তাঁহার প্রভুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত তিনি কোনও অশিষ্ট ব্যবহার করেন

নাই। আজ অসম্মানজনক উক্তি শুনিয়া তাহার উদ্ধত প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিল সে একটু উষ্মার সহিত বলিল, "আপনি বোধ হয়, একটু অনধিকারচর্চ্চা করিতেছেন। আপিসের কাজের সঙ্গে কাহারও বেশভূষার বাহুল্য বা:পারিপাট্যের কোন সংস্রব নাই। আর আমার বাবুয়ানার সঙ্গেও বোধ হয় সাহেবেরও কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।"

আজ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী, আপিসের হর্ত্তা-কর্ত্তারূপ এই বড়বাবুটির মুখের উপর এমন দুঃসাহসের পরিচয় কেহ দিতে পারে নাই। তিনি সবিস্ময়ে এই নবীন কেরাণীর মুখের-দিকে কয়েক মিনিট তাকাইয়া থাকিয়া পরে তাহাকে নিঃশব্দে বিদায় দিলেন। সতীশচন্দ্র বুঝিল, এইবার কেরাণী-জীবনের আর এক অঙ্ক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। এবার হয় ত নূতন দৃশ্যপটের অবতারণা শীঘ্রই হইবে।

৫

তাহার অনুমান মিথ্যা নহে। কাজকর্ম্মের নানা প্রকার ক্ষুদ্র খুটিনাটি লইয়া ইদানীং হেডক্লার্ক প্রায়ই তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে আরম্ভ করিলেন। সতীশচন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোন মতেই সে হটিবে না। অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক সে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইত, সে জন্য বড়বাবু চেষ্টা করিয়াও সহসা তাহার কাজের বিশেষ কোনও ক্রটী আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। একদিন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য তিনি সতীশচন্দ্রকে ডাকাইয়া তাহার স্কন্ধে দোষারোপের চেষ্টা করিয়াছিলেন। চোখ রাঙ্গাইয়া চড়াগলায় কি বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ধীরভাবে সতীশচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, যে ক্রটীর জন্য তিনি মেজাজ গরম করিতেছেন, তাহার জন্য সে আদৌ দায়ী নহে এবং ভবিষ্যতে কোনও কার্য্যের প্রয়োজন হইলে তিনি কাগজে-কলমে যেন তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ গ্রহণ করেন। মৌখিক আলোচনা কবিবার স্পৃহা এবং অবকাশ তাহার আদৌ নাই।

সে দিন সকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বেলা সাড়ে নয়টার সময় বৃষ্টি ধরিলে সতীশচন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইল। আজ তাহাব আপিসে পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। সে কল্পনা-নেত্রে অনুমান করিয়া লইল, হেডক্লার্ক আজ তাহার এই অপরাধ লইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া :বসিবেন। ব্যাপারটি মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সে পরম কৌতুক অনুভব করিল। অভিজ্ঞতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

আজ বেলা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং গাড়ী বোধ হয় এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, আপিসের কাছাকাছি আসিয়াই কথাটা সতীশের মনে অকস্মাৎ উদিত হইল। উভয়ের এই যে নীরব-দর্শন, ইহা নিত্য-ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

রাজপথে জনতা দেখিয়া সতীশ দ্রুতপদে সেই দিকে চলিল। দেখিল, একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী পথের এক পার্শ্বে কাত হইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই অপর পার্শ্বে প্রত্যহ-দৃষ্ট সেই জুড়ি দাঁড়াইয়া। দেখিয়াই সে বুঝিল যে, দুইখানি গাড়ীতে সংঘর্ষ হইয়াছে। জুড়ি-গাড়ীর কোচম্যান এবং ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ান উভয়েই ভূমিশায়ী। পথের ফুটপাথের উপর বিবর্ণমুখে নবীনা সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে। কৌতূহলী জনতা শুধুই জটলা করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সতীশ ঘটনাস্থলে গিয়া সহিসের সাহায্যে কোচম্যান ও গাড়োয়ানকে উঠাইল। সাংঘাতিকরূপে আহত না হইলেও তাহাদের উভয়েরই চলৎশক্তি ছিল না। অন্য একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উভয়কে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সতীশ সসম্ভ্রমে অপরিচিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অজ্ঞাত-কুলশীল হইলেও সেই দুর্ঘটনার সময় একটা পরিচিত মুখ দেখিয়া নবীনার আনন সহসা আলোকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সতীশ সংক্ষেপে বলিল, "আপনি গাড়ীতে চড়িয়া বসুন। ঘোড়া ও গাড়ীর বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই।"

কৌতূহলী জনতার দৃষ্টিপথ হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য যন্ত্রচালিতবৎ নবীনা গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল। সতীশ সহিসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই গাড়ী হাঁকাইতে পারিস্?"

সে যাহা বলিল, তাহাতে সতীশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। নবীনা মৃদুস্বরে বলিল, "ও নূতন লোক, বোধ হয় পারিবে না। এখন কি হইবে?"

তখন সতীশচন্দ্র বলিল, "আমার জুড়ি হাঁকান অভ্যাস আছে; কোথায় যাইবেন, বলুন, আমি পৌঁছিয়া দিয়া আসিতেছি।"

লজ্জারক্ত আননে নবীনা বলিল, "আপনি যাইবেন? আপনার তাহাতে কত কষ্ট হইবে। বিশেষতঃ আপনার আপিসের বেলা—"

বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র বলিল, "সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। এখন কোথায় যাইতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আপনাকে রাখিয়া দিয়াই আমি আপিসে ফিরিতে পারিব।"

"তবে কলেজে—বেথুন কলেজেই গেলে ভাল হয়; কিন্তু আপনার বড় কষ্ট হবে। বিশেষতঃ—"

সতীশচন্দ্র ততক্ষণে কোচবাক্সে চাপিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়াছিল।

যথাস্থানে পঁহুছিয়া নবীনা সহিসকে ঘোড়াদুইটিকে আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ীতে খবর দিবার জন্য আদেশ করিল। তার পর নতমস্তকে মধুর ভঙ্গীতে সতীশকে অভিবাদন করিয়া, তাহার অযাচিত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বেলা প্রায় বারটার সময় আপিসে আসিতেই হেডক্লার্ক তাহার অকারণ বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিলেন। সে বুঝিল, আজ বড়বাবু তাহাকে বাগে পাইয়াছেন, অল্পে ছাড়িবেন না। সে সংক্ষেপে পথের দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করিল।

বড়বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "তোমার ও সব বাজে কথা শুনিতে চাই না। এটা গবর্ণমেণ্টের আপিস, ইয়ারকি দেবার জায়গা নয়। তুমি কোথায় সারা রাত্রি জাগিয়া, ইয়ারকি দিয়া ইচ্ছামত যখন তখন আপিসে আসিবে, এরূপ আব্‌দার চলিবে না, আমি আজই তোমার নামে রিপোর্ট করিব।"

সতীশচন্দ্রের আজ মেজাজ ভাল ছিল না। তার পর এরূপ শ্লেষ,বিদ্রূপ এবং কটূক্তি, বিশেষতঃ তাহার চরিত্রের প্রতি এমন নির্ম্মম ইঙ্গিত সহ্য করা কোনও কালেই তাহার অভ্যাস ছিল না। সে তীব্রভাবে বলিল, "আপনার যা খুসী, তাই করতে পারেন। আমার বক্তব্য বলিয়াছি, বিশ্বাস না করেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি মনে রাখিবেন, ভদ্রসন্তানের সহিত আপনি কথা বলিতেছেন। ওরূপভাবে ব্যঙ্গ করিবার কোনও অধিকার আপনার নাই, সেটা ভুলিবেন না।"

সতীশচন্দ্র নিজের আসনে ফিরিয়া গিয়া গম্ভীরভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হেডক্লার্ক সাহেবের নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিবেন, অন্যান্য কেরাণীরা সে কথা তাহাকে গোপনে জানাইয়া গেল।

আপিসের কেরাণীরা বড়বাবুকে ভয় করিয়া চলিত। কারণ, তাহারা জানিত, তিনিই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু মনে মনে কেহই এই অত্যাচারী বড়বাবুটির প্রতি প্রসন্ন ছিল না। শুধু যে কয়জন আত্মীয়কে তিনি নিজের আপিসে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল। কারণ, সুবিধা তাহারাই ভোগ করিতে পাইত। সাহেব দুই আপিসে কাজ করিতেন। এজন্য এই আপিসের কার্য্য-পরিচালনের ভার হেডক্লার্কের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি শুধু সহি করিয়া খালাস।

৬

পরদিবস আপিসে আসিবার সময় সতীশ আকাঙ্ক্ষিত জুড়ির প্রতীক্ষায় মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, গাড়ীখানি মৃদুগতিতে আসিতেছে। আজ একটু পূর্ব্বেই দেখা

হইয়া গেল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নবীনা কোচম্যানকে কি ইঙ্গিত করিল। এ লোকটি নূতন। সে তখনই অশ্বরজ্জু সংযত করিল। সহিস দৌড়িয়া সতীশের কাছে আসিয়া "মেমসাহেবের" সেলাম জানাইল। "মেমসাহেব" শব্দে সতীশ একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া অপরিচিতা বলিল, "আমায় ক্ষমা করিবেন। কা'ল আপনার নাম ও ঠিকানা লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দয়া করিয়া উহা আমাকে দিবেন কি ?"

সতীশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার নাম ও ঠিকানায় আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন হইতে—"

নবীনা তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার উপকারকের নামধাম জানিব না, এত বড় অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনার যোগ্য নহে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই খাতায় লিখিয়া দিন।" বলিয়া সুন্দরী তাহার বাঁধান খাতা ও ফাউণ্টেনপেন্‌টি সতীশের সম্মুখে ধারণ করিল। তাহার মিষ্ট অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সতীশ তাহার নিজের নাম লিখিয়া দিল; কিন্তু ঠিকানা লিখিবার সময় সে তাহার বন্ধু অবিনাশের বাড়ীর ঠিকানা দিল।

নবীনা একখানি কাগজে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া সতীশচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "যদি কখনও আমাদের ওদিকে যান, দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী যাইবেন।"

নমস্কার আদান-প্রদানের পর গাড়ী চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র দেখিল, কাগজে নাম লেখা রহিয়াছে—"কুমারী অনিলা রায়, ৩নং বালিগঞ্জ।"

সে দিনও আপিসে আসিতে তাহার পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে অন্যান্য কেরাণীদের নিকট শুনিতে পাইল, বড়বাবু সাহেবের নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিয়াছেন। আজ খোদ বড় সাহেব বারোটার পর আপিস দেখিতে আসিবেন। তিনি সিমলা-শৈল হইতে সংপ্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছোট সাহেব তাঁহার নিকট সতীশের অবাধ্যতার ব্যাপার পেশ করিবেন বলিয়াছেন। বড়বাবু তাহার স্কন্ধে যে সকল অপরাধ চাপাইয়াছেন, তাহার পরিণামফল বড়ই গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। উপরওয়ালার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ এবং তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি, চাকরী পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি হইতে পারে। সতীশ আরও সংবাদ পাইল, বড়বাবুর প্ররোচনায় ছোট সাহেব তাহার উপর নাকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাহাদের ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্ত্তা যখন ঘটনাবশে স্বয়ং আপিসে আসিতেছেন, তখন গুরুতর বিষয়ের বিচার তিনিই করিবেন, সাহেব এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া নিজের আসনে বসিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, তাহার কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার

অবসর শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর এ অভিনয় চলিবে না। বড় সাহেব ম্যাক্‌ফার-সন যখন আজ আপিসে আসিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিতে বসিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার ডাক পড়িবে। তখন?—তিনি ত নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিয়া ফেলি-বেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সাহেব প্রায়ই তাহাদের বাড়ী গিয়া থাকেন। তাহার সহিত ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়! তিনি তাহাকে কতদিন কতবার নানাপ্রকার উপহার দিয়াছেন। তাহার রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও সে দিন তিনি এক প্রস্থ ডাকে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র আপন মনে কাজ করিতে করিতে এমন নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, চাপরাসী আসিয়া যখন তাহাকে জানাইল যে, বড়বাবু সাহেবের ঘরে তাহাকে ডাকিতে-ছেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, বারোটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়া গিয়াছে।

দুই এক'জন পরিণতবয়স্ক কেরাণী মৃদুস্বরে তাহাকে উপদেশ দিল, সাহেবদিগকে যেন আভূমি নত হইয়াই সে সেলাম করে। আর মার্জ্জনাভিক্ষা করাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত, কারণ, বড়বাবু তাহা হইলে প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রতি লঘু দণ্ডের জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতেও পারেন। ইত্যাদি।

কাহারও কথার কোনও উত্তর না দিয়া প্রশান্তভাবে সতীশচন্দ্র সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। একটি মুক্ত বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া সাহেবদ্বয় নিবিষ্টভাবে কি আলোচনা করিতেছিলেন। সতীশ বুঝিল, তাহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ছোট সাহেব বলিয়া যাইতেছেন আর বড় সাহেব নতমস্তকে তাহা শুনিতেছিলেন। হেড্‌-ক্লার্ক একটা সরল বিস্ময়ের চিহ্নের মত অদূরে কাগজ-পত্র-হস্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সতীশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সাহেবযুগল ফিরিয়া চাহিলেন। ম্যাক্‌ফারসন্‌ সাহেব ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া চসমার মধ্য হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাহিলেন, সে তাঁহাকে স্পষ্ট স্বরে গুড্‌মর্ণিং করিয়া অভিবাদন করিল। ম্যাক্‌ফারসন্‌ সাহেবের মুখে অকস্মাৎ প্রসন্নতার হাস্য উদ্ভাসিত হইল, তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, সতীশ, তুমি—তুমি এখানে?" বলিয়াই দ্রুতবেগে কক্ষতল অতিক্রম করিয়া প্রবল-বেগে সতীশচন্দ্রের কর-কম্পন করিলেন। তার পর বিস্ময়বিমূঢ় ছোট সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এটি আমার বিশেষ বন্ধু রাধাগোবিন্দ মিত্রের—রায় বাহাদুর রাধা-গোবিন্দের ছোট ছেলে, তুমি নিশ্চয় তাঁহাকে চেন। রাজস্ব-বিভাগের তিনি একজন বড় কর্ম্মচারী। হাঁ, তিনিই। সতীশ, তোমার বাবার কাছে শুন্‌লাম যে, রায়চাঁদ-প্রেম-চাঁদ বুঝি এবার তুমিই পাইয়াছ। কা'ল দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।" ছোট সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হ্যামিল্‌টন, এ ছেলেটির গুণ তুমি জান না?

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি রত্নবিশেষ। যাক্, সতীশ, তুমি এখানে কি মনে ক'রে?"

হেড্ক্লার্ক কাঠের পুতুলের মত নির্ব্বাকভাবে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনের সতীশ মিত্র রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী! আবার স্বনামধন্য রাধাগোবিন্দ মিত্রের পুত্র! ছোট সাহেবও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে হ্যামিলটন্ সাহেব ঘটনাটার কথা সংক্ষেপে বড় সাহেবকে বলিলেন।

সবিস্ময়ে বড় সাহেব বলিলেন, "তুমি ত্রিশ টাকার মাহিনায় আমার আপিসে কাজ লইয়াছ, সতীশ? কেন, কি দুঃখে?" পরক্ষণেই ছোট সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অন্য কোন নিরিবিলি ঘর আছে, চল, সেই ঘরে গিয়া আমরা এই ব্যাপারটার ব্যবস্থা করি।" ছোট সাহেব নিজের খাস-কামরায় বড় সাহেবকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। ম্যাক্ফারসন্ সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুধু তুমি আমাদের সঙ্গে এস, সতীশ!"

অপমানিত বড়বাবু নতমস্তকে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ কি তিনি শুধু স্বপ্নই দেখিতেছেন? ইন্দ্রজাল নহে ত?

* * * * * *

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সাহেবদ্বয় হাসিয়াই অস্থির। কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সতীশচন্দ্র এমন ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ব্যাপারটা উপন্যাসের মতই কৌতুকাবহ। তার পর বড়বাবুর দুর্ব্ব্যবহারের কথা সে স্পষ্টভাবেই সাহেবদিগকে জানাইয়া দিল। অল্পবুদ্ধি বাঙ্গালী ক্ষমতার গর্ব্বে কিরূপ নীচ, স্বার্থপর ও অত্যাচারী হয়, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আপিসের বড়বাবুরা, এ কথা নির্দ্দেশ করিতে সতীশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। বড় সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা খুবই সত্য, সতীশ, কিন্তু সে দোষ ইংরাজের নয়।"

সতীশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনারা নিজের কর্ত্তব্য পালন করিলে কেহ এই প্রকার অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। আপনারা হেড্ক্লার্কদিগের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান বলিয়াই তাহারা আপনাদের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া থাকে।"

সাহেবদ্বয় সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না।

ম্যাক্ফারসন্ বলিলেন, "তার পর তোমার Research এখানে আর কত দিন চলিবে?"

"আজ্ঞে, আর চলিল কই? আপনি আসিয়াই সব গোলমাল করিয়া দিলেন।"

"তুমি যদি সত্যই চাকরী করিতে চাও, তবে তোমাকে একটা ভাল কাজ আমি দিতে পারি। কালে তুমি খুব বড়দরের রাজ-কর্ম্মচারী হইতে পারিবে।"

সতীশ বলিল, "ধন্যবাদ ; কিন্তু চাকরীর সখ আমার মিটিয়াছে। ও পথে আর যাইব না মহাশয়। আচ্ছা, তবে এখন আসি সাহেব। একবার বড়বাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে হইবে। সাহেব, আপনি বাবাকে এ সকল কথা বলিবেন না। আচ্ছা, নমস্কার! নমস্কার, মিঃ হ্যামিল্টন্!"

সাহেবদ্বয়গল সাদরে তাহার করমর্দ্দন করিলেন।

৭

মাতা বলিলেন, "বাবা, পড়া ত শেষ হইল, এইবার বৌ ঘরে আন্‌বার বন্দোবস্ত করি?"

সতীশচন্দ্র কেরাণীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া কয়দিন নিতান্ত কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছিল। কয়মাস একটা নূতনত্বের মধ্য দিয়া সে চলিতেছিল। প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিন জীবন-যাপনের প্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়া সে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। উদ্ধত প্রকৃতিটা স্বেচ্ছায় বরণ করা শাসন শৃঙ্খলার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া অনেকটা শান্ত হইয়াছিল, সে জন্য অন্য সময়ে বিবাহের বিরুদ্ধে সে যতটা জোর করিয়া মতপ্রকাশ করিত, আজ ততটা করিতে পারিল না। নম্রকণ্ঠে সে বলিল, "বিবাহ দিতে চাও দাও। কিন্তু তার আগে বাবাকে বলিয়া একটা কারবার খুলিতে বলিয়া দাও। কাজ আরম্ভ না হইলে বিবাহ করা চলিবে না। আর একটা কথা, মেমসাহেবগোছের বৌ ঘরে আনিতে পারিবে না। ও সব আমি পছন্দ করি না।"

তাহার কনিষ্ঠ সহোদরা লীলা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ; সে বলিল, "মেমসাহেব আবার কাকে বলে? লেখা-পড়া করিলে কি ভাল জামা-কাপড় পরিলেই কি মেম-সাহেব হয়?"

গম্ভীর-স্বরে সতীশ বলিল, "না, তা হয় না বটে ; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, হিন্দু, আমাদের ঘরের মেয়েরা লক্ষ্মীর মত পায় আল্‌তা, কপালে সিঁদুর টিপ পরিবে, তাহা না করিয়া জুতা পায় দিয়া, পাউডার মাখিয়া, পেখম ধরিয়া বেড়াইলে বড়ই বিশ্রী দেখায়, এ রকম বৌ যার ভাল লাগে লাগুক, আমি ত বরদাস্ত করিতে পারিব না।"

মাতা ও কন্যা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। সতীশের এ ইঙ্গিত যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা উভয়েই বুঝিলেন।

লীলা বলিল, "তা তোমার জন্য বাবা যে মেয়ে ঠিক করেছেন, নিজের চোখে একবার তাকে দেখ্‌বে ?"

মাতা বলিলেন, "সে ভাল কথা। এ কালের সব ছেলেই ত নিজেরা দেখে বিয়ে করিতেছে। তোর মত যদি হয়, তা হ'লে বন্দোবস্ত করা যায়।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তোমরা ক্ষেপেছ নাকি ? বাপ-মা থাকৃতে যে সব ছেলে নিজে মেয়ে দেখ্‌তে যায়, আমি কোন দিন তাদের বুদ্ধির প্রশংসা কর্‌তে পার্‌ব না। সন্তানের ভালমন্দ মা-বাপের চেয়ে কেহই ভাল বুঝ্‌তে পারে না। তোমরা যা ঠিক কর্‌বে, তাই হবে। তবে মেমসাহেব না হলেই হ'ল।"

৮

বন্ধু অবিনাশ একখানি সুদৃশ্য খামে আঁটা পত্র সতীশচন্দ্রের হাতে দিল। সে পড়িয়া দেখিল, উপরে তাহারই নাম। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে খামখানি খুলিয়া দেখিল, ছোট একখানি সুদৃশ্য কাগজে কয় ছত্র লেখা ;—"সবিনয় নিবেদন,আমার জন্ম-তিথি উপলক্ষে বাড়ীতে ক্ষুদ্র প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছে, দয়া করিয়া পদধূলি দিলে সুখী হইব। বাবার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আশা করি, আমাদিগকে আপনার সঙ্গলাভে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি নিবেদিকা অনিলা রায়।"

অবিনাশ বলিল, "ব্যাপার কি হে ?"

"সে একটা রোমান্স। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।" এই বলিয়া সে ক্ষুদ্র কাহিনীটি বলিয়া গেল।

অবিনাশ বলিল, "প্রেমে পড় নাই ত ? এরূপ ক্ষেত্রে এ রকম হয়, অন্ততঃ কেতাবে লেখে।"

সতীশ হাসিতে লাগিল। অবিনাশ আবার বলিল, "নিমন্ত্রণে যাবে না কি ?"

"হাঁ, ব্যাপারটা দেখে আসা যাক্‌। কিন্তু একটা কথা ভাবিতেছি, আমার বিবাহের সম্বন্ধ যেখানে হইতেছে, শুনিয়াছি, তাঁহারাও বালিগঞ্জে থাকেন। যদি এই বাড়ীতে তাঁদেরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, তবে সেখানে দেখা হইয়া যাইতে পারে। মা বাবা যদি পরে জানিতে পারেন, ভাবিবেন, আমি কৌশল করিয়া সেখানে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলাম।"

অবিনাশ বলিল, "আরে, বালিগঞ্জ কি একটা ছোট জায়গা ? সেখানে অনেক লোকের বাস। জন্মতিথির প্রীতিভোজে খুব আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবই নিমন্ত্রিত হয়। এ খুব ছোট ব্যাপার। দেখিতেছ না, কার্ড পর্য্যন্ত ছাপায় নাই।"

বন্ধুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া সতীশচন্দ্র নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। ৩ নং বালিগঞ্জ রোডস্থ ভবন খুঁজিয়া লইতে তাহাকে কোনই বেগ পাইতে হইল না।

নীচের হলঘরে প্রবেশ করিতেই কয়েকজন সুবেশধারী ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। নিমন্ত্রিতগণ তখনও সকলে আসেন নাই, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় উপরেই ছিলেন। ভৃত্যগণ তাহাকে উপরে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সতীশের ইচ্ছা, অধিক লোকের সহিত এখানে দেখা-সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল। অনিলা রায়ের সহিত দেখা করিবার কথা জানাইয়া একখানি কাগজে সে তাহার নাম সহি করিয়া দিল।

পর-মুহূর্ত্তেই একখানি ফিরোজা রঙ্গের জরীর ফুল দেওয়া মূল্যবান্ ঢাকাই শাড়ী পরিয়া নগ্নপদে অনিলা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চরণে জুতার পরিবর্ত্তে অলক্তক-রেখা দেখিয়া সতীশ বিস্মিত হইল! মেমসাহেব বলিয়া যাহাকে সে একটু কৃপার চক্ষেই দেখিত, জন্মতিথি উপলক্ষে সে বাঙ্গালী-রমণীর স্বাভাবিক বেশে তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হওয়ায় সতীশচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল, "আজ আপনাকে চমৎকার দেখাইতেছে।"

লজ্জার অরুণরাগ তাহার আননে ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আসুন, বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করাইয়া দেই।"

সতীশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি উপরে যাইব না। অন্যত্র আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে আপনি দুঃখিত হইবেন বলিয়াই আমি আসিয়াছি। যদি কিছু মনে না করেন, তবে—"

"আচ্ছা, আপনি তবে এইখানে বসুন, আমি বাবাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

অনিলা দ্রুত ও লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র অন্যমনে দেওয়ালের সুদৃশ্য চিত্রগুলি দেখিতেছে, এমন সময় পরিচিতকণ্ঠে কেহ ডাকিল, "দাদা, তুমি? তুমি এখানে?"

চমকিতভাবে সতীশ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ভিতরের দ্বারপথে তাহার সহোদরা লীলা দাঁড়াইয়া।

মৃদু হাসিয়া লীলা বলিল, "মেয়েটিকে কেমন দেখিলে? পছন্দ হয়? মেমসাহেব, না, বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী মেয়ে?"

সতীশচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "তুই কি বল্‌ছিস্, কার কথা বল্‌ছিস্? আর এখানেই বা এলি কি ক'রে?"

লীলা বলিল, "বাঃ! এখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে, এসেছি। মা, বাবা, তাঁরাও উপরে আছেন। এটা যে রায় রামজীবন চৌধুরীর বাড়ী, তা জান না? যাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে গো! অনিলা তাঁরই একমাত্র মেয়ে—এইমাত্র তোমার

সঙ্গে কথা কচ্ছিল। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবে তার সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছ বল ত? দু'জনের যে বেশ জানাশোনা আছে দেখছি। পছন্দ হয়েছে ত?"

সতীশচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "দূর হয়ে যা বাঁদরি! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"

সহসা পদশব্দ পাইয়া লীলা সেখান হইতে সরিয়া গেল। তাহার মুখের জবাব মুখেই রহিয়া গেল।

অনিলা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত হলঘরে প্রবেশ করিল। সে বলিল, "বাবা, ইনিই সে দিন আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ইঁহার কথাই আপনাকে বলেছিলাম।"

রামজীবন বাবুকে সতীশ চিনিত। তিনিও তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন। সতীশের দিকে চাহিতেই তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি? তা নীচে দাঁড়িয়ে কেন? এস বাবা, উপরে চল, তোমার বাবা ও মা সেখানে আছেন। পাগ্‌লী মেয়ে, তুই সতীশকে নীচে বসিয়ে রেখে গেছিস্; একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নাই।"

অনিলা অবাক্ হইয়া একবার পিতা, আরবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল। তাহার পিতার কি মতিভ্রম হইয়াছে?

কন্যার বিস্মিত ভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "রাধাগোবিন্দ বাবুর পুত্র ইনি। লীলার দাদা। চল বাবা, উপরে চল। ওহে হরিশ, সতীশ বাবুকে উপরে নিয়ে চল ত। আমি একবার গেটের কাছে যাই।"

হরিশ আখ্যাধারী ভদ্রলোকটি সতীশের কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সতীশচন্দ্রও অধিকতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখানে যে বড়বাবু?"

"রামজীবন বাবু যে আমার মামাত ভাই। কিছু মনে করিও না সতীশ বাবু, তোমার সঙ্গে না জানিয়া আমি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম।"

সতীশচন্দ্র বিনয়-নম্রস্বরে বলিল, "গতস্য শোচনা নাস্তি। ও কথা ছাড়িয়া দিন।"

হরিশ বাবু সতীশচন্দ্রের হাত ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

অনিলা নতনেত্রে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল "বাবা!"

"কি মা?"

"আপনার ভুল হয় নাই ত? উনি যে কেরাণী, আমি স্বচক্ষে ইঁহাকে আফিসে কাজ করিতে যাইতে দেখিয়াছি। রাধাগোবিন্দ বাবুর ছেলে কি কেরাণীগিরি করিতে যাইবেন?"

উচ্চহাস্য করিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "সতীশকে আমি ভুল করিব? বলিস্ কি? সে ঘটনা আমি আজ তোর হরিশ কাকার মুখে শুনিয়াছি। কেরাণী-জীবনের বিবর

প্রবন্ধ লিখিবে বলিয়া সতীশ কয় মাস সথ করিয়া হরিশের আপিসে গিয়াছিল। সে এক মজার ব্যাপার! তোমার হরিশ কাকার কাছে শুনো। এখন উপরে যাও মা, আমি ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তোমার এখন উহাঁদের কাছে থাকা চাই। বেশ লক্ষ্মীটির মত থেক মা আমার!"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লঘুগতিতে অনিলা উপরে চলিয়া গেল। তাহার বুকের উপর হইতে যেন একখানি পাষাণ নামিয়া গিয়াছিল। তিনি তবে কেরাণী নহেন!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ঠাকুর হরিদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নীলাচলে

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-লীলা সাঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চারিজন গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু আর কাহাকেও সঙ্গে নিলেন না। হরিদাস ঠাকুর কাঁদিয়া বলিলেন, "প্রভো! তুমি ত নীলাচলে চলিলে। আমার গতি কি হইবে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া বাঁচিব?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন,
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে যাইয়া কিছুকাল অবস্থানের পর তীর্থদর্শনোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। বৎসরাধিক কাল দক্ষিণের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, গৌড়ীয় ভক্তগণকে তথায় আসিবার জন্য লোকমুখে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে অগ্রণী করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরও আসিলেন। মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের এক উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, ভক্তগণ যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হরিদাসঠাকুর তাঁহার স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ বশতঃ মহাপ্রভুর বাটীতে না যাইয়া বাহিরে পথের পার্শ্বে বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

"মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা,
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত নমস্কার-প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক একে একে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কিন্তু হরিদাসঠাকুরের না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি আসিয়া পথের ধারে বসিয়া রহিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা হরিদাসঠাকুরের নিকট যাইয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞা জানাইল। কিন্তু হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"আমি নীচজাতি, শ্রীমন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে আমার অধিকার নাই। যদি শ্রীমন্দির হইতে কিছু দূরে নির্জ্জনমত একটু স্থান পাই, তবে সেখানেই পড়িয়া থাকিব, এক প্রকারে দিন কাটিয়া যাইবে। এ অঞ্চলে থাকিলেই হয়:ত কখন অলক্ষিতে জগন্নাথের কোন সেবককে স্পর্শ করিয়া অপরাধের ভাগী হইব, এই আশঙ্কা। আমার ইচ্ছা যে, একটু দূরে যাইয়া থাকি, তাহা হইলে সে ভয় থাকিবে না।"

লোকেরা যাইয়া সে কথা মহাপ্রভুকে জানাইল। হরিদাসঠাকুরের এইরূপ বিনয়, সাবধানতা ও মর্য্যাদাবোধ দেখিয়া মহাপ্রভু মনে মনে সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থানে বাসা দিবার জন্য সংকল্প করিলেন।

"এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল,
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত নিষ্কাম প্রেম-ভক্তি-যোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে এইরূপ উন্নত অধিকারী ভক্তগণের সহিত সর্ব্বদা প্রেমে গলাগলি করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বর্ণ ও আশ্রমের মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এই কারণে তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণ সকলেই মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। কোনও সমাজের, সম্প্রদায়ের অথবা ব্যক্তির মর্য্যাদা-লঙ্ঘন তাঁহাদিগের নিকট গুরুতর অপরাধের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ দিকে কাশীমিশ্র পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণের জন্য বাসস্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ভার গোপীনাথ আচার্য্যের উপর পড়িল এবং ভক্তগণের সেবার

বন্দোবস্তের ভার থাকিল বাণীনাথ পট্টনায়কের উপর। ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্র বৈষ্ণবগণের নীলাচলে অবস্থানের সমস্ত ব্যয় সমাধান করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া মহাপ্রভুর অনুমতি পূর্ব্বেই চাহিয়া লইয়াছিলেন। মহাপ্রভু কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী তোমার নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে যে একখানি ঘর আছে, তাহা আমাকে দিতে হইবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" তাহাতে কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঠাকুর, তোমারই ত সব। আমাকে জিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন কি?"

গোপীনাথ আচার্য্য মহাশয় সমস্ত বাসা সংস্কার পূর্ব্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখিলেন। বাণীনাথ প্রচুর পরিমাণে অন্ন, পিঠা, পানা প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত প্রস্তুত জানিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে স্নান-আহ্নিক করিতে আপন আপন বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবগণ বিদায় হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হরিদাসকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া রাজপথে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, হরিদাস পথের ধারে বসিয়া প্রেমানন্দে নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছেন, নয়নে ধারা বহিতেছে। মহাপ্রভুকে দেখিয়াই হরিদাস তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দুই হস্তে ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

"তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে;
হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে,
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন—"প্রভো! কি কর? কি কর? আমাকে ছুঁইলে? আমি অস্পৃশ্য অধম, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও।"

তখন মহাপ্রভু যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান,
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ, দান।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন,
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু কি হরিদাস ঠাকুরের অতিস্তুতি করিলেন ? না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

অর্থ—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু, যাঁহারা তোমার নাম করেন, তাঁহারাই তপশ্চারী তাঁহারাই হোমকারী, তাঁহারাই তীর্থস্নায়ী, তাঁহারাই সদাচারী আর্য্য এবং তাঁহারাই বেদাধ্যায়ী।

অতঃপর মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানে লইয়া গিয়া সেই নির্জ্জন গৃহে তাঁহাকে বাসা দিলেন, এবং বলিলেন,—"তুমি এই স্থানে থাকিয়াই নামকীর্ত্তন করিবে এবং শ্রীমন্দিরের চূড়া ও চক্র দর্শন করিবে। এই স্থানেই তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসিবে। আমি প্রত্যহ একবার আসিয়া তোমার সঙ্গ করিব।" ঠাকুর হরিদাস তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থান এক্ষণে "সিদ্ধ বকুল" নামে প্রসিদ্ধ। হরিদাসকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়াই অগ্রে আপন সেবক গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসঠাকুরের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নিজে প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

উক্ত গোবিন্দ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন। তাঁহারই আদেশক্রমে মহাপ্রভু ইঁহাকে আপনার সেবকরূপে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া কখন কখন কোনও কোনও উদ্যানবাটীতে যাইয়া সংকীর্ত্তন-মহোৎসব করিতেন। হরিদাসঠাকুরও সেই সঙ্গে কীর্ত্তনে-নর্ত্তনে যোগ দান করিতেন। কিন্তু ভোজনের সময় বৈষ্ণবগণের পংক্তি ছাড়িয়া দূরে যাইয়া স্বতন্ত্রভাবে বসিতেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলেই মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে হরিদাসঠাকুরের সন্ধান লইতেন। কিন্তু হরিদাসঠাকুর মর্য্যাদালঙ্ঘনের ভয়ে কাছে ঘনাইতেন না।

"হরিদাস" বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন,
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে,
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীরূপের আগমন

এই সময়ে এক দিন শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিদাসঠাকুরের স্থানে যাইয়া বাসা লইলেন। তিনি মহাপ্রভুর বাটীতে গেলেন না। এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি জীবনের প্রথম ভাগে গৌড়ের ম্লেচ্ছ বাদশাহের চাকুরী করিবার সময় সদাচারভ্রষ্ট ও 'দবির খাস' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সামাজিক হিসাবে আপনাকে পতিত জ্ঞান করিতেন। মহাবিজ্ঞ, মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিত ও বহু বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর এই প্রকার বিনয় এক অদ্ভুত বস্তু, সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' 'বিদগ্ধমাধব,' 'ললিতমাধব,' 'উজ্জল-নীলমণি,' 'দানকেলিকৌমুদী,' 'গোবিন্দবিরুদাবলী,' ও 'লঘু-ভাগবতামৃত' প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এজন্য তিনি বৈষ্ণব-সমাজের একটি প্রধান এবং উজ্জল স্তম্ভস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকেন। হরিদাসঠাকুরের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। তিনি যত কাল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলেন, হরিদাসঠাকুরের আশ্রমেই ছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন আসিয়া উভয়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া যাইতেন।

হরিদাসঠাকুরের আশ্রমে অবস্থানকালে রূপ গোস্বামী সুপ্রসিদ্ধ 'বিদগ্ধমাধব' নাটক রচনা করিতেছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু হরিদাসের স্থানে আসিয়া উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপি হাতে লইয়া উহার পাতা উল্টাইতেই, একটি শ্লোক বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং হরিদাস ঠাকুরকে শ্লোকটি পড়িয়া শুনাইলেন।

হরিদাসঠাকুর শ্লোক শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং উহার শত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা সাধুমুখে শুনিয়াছি ও শাস্ত্রে দেখি-য়াছি, কিন্তু নামমাধুর্য্য সম্বন্ধে এমন সুন্দর বর্ণনা আর কোথাও শুনি নাই।"

"শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী,
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি,

কৃষ্ণ-নামের মহিমা শাস্ত্র-সাধুমুখে জানি,
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুর যে শ্লোকটির এত প্রশংসা করিলেন, যাহা পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও হরিদাসঠাকুর উভয়েই ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত শ্লোকটি এই—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

শ্লোকার্থ।—'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ যখন বদনমধ্যে অর্থাৎ রসনায় নৃত্য করে, তখন অসংখ্য রসনা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে; যখন কর্ণ-কুহরে ক্রীড়াশীল হয়, তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণপ্রাপ্তির বাসনা জন্মে; আর যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার স্তম্ভিত হয়। আহা! এমন যে দুটি বর্ণ কৃষ্ণনাম, তাহা যে কি অমৃত দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, জানি না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্ব-রাগের অবস্থায় কৃষ্ণনামের মাধুর্য্যে বিহ্বলা ব্রজাঙ্গনার উক্তি এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদটি উক্ত শ্লোকের অনুবাদ।

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ ইতি আখর দুটি বদনে যব বিলসতি
বাঢ়য়ে রতি রসনা কোটি লাগি। (রে সখি)
মম শ্রবণ-কন্দরে যবহু পুন ক্রীড়তি
রতি শ্রবণ অর্ব্বুদ লাগি। (রে সখি)
যবহু পুন পরশে হৃদি, প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি
স্তব্ধ রহু মানি বহু ভাগি। (রে সখি)
কতহু সুধারস ছানি সৃজিলা বিহি না জানি
ধনিরে ধনি মরমে রহু জাগি। (রে সখি)

হরিনাম সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু নামের শক্তিতে তেমন জলন্ত বিশ্বাস কয় জনের আছে? শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস না করা একটি নামাপরাধ। নামাপরাধ প্রধানতঃ দশটি;—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীশিবের সত্য, নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা।

(৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্ত মনুষ্যবুদ্ধি করা। (৪) হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মহিমা-সমূহকে কেবল প্রশংসামাত্র মনে করা। (৫) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা। (৬) নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি। (৭) শ্রীহরি-নামের সহিত ব্রত, দান প্রভৃতি শুভ কর্ম্মের সমতুলনা। (৮) শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া। (৯) নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। (১০) নামে অহংমমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহু নাম কীর্ত্তন, গ্রহণ বা প্রচার করিয়া থাকি ইত্যাদি ভাব। নামাপ-রাধ হইলে পুনঃ পুনঃ নামগ্রহণ দ্বারাই সে অপরাধের ক্ষালন হইয়া থাকে।

নাম-মাহাত্ম্যে হরিদাস ঠাকুরের যেরূপ একান্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা সকলের আদর্শ-স্থানীয়। কণামাত্র অগ্নির সংযোগে পর্ব্বতপ্রমাণ তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহা যেমন সুসত্য, তদ্রূপ হরিনামের আভাসেই জন্মজন্মান্তরের পাপপুঞ্জ দূরীকৃত হয়, ইহাও হরিদাসঠাকুরের নিকট তেমনই একটি সুপরীক্ষিত সত্য। ইহার ভিতরে যেন-বুঝি-হয়ত নাই। তাঁহার নিকট ইহা নিরপেক্ষ সত্য।

একদিন মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরের কুটীরে আসিয়া কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"দেখ হরিদাস! এই কলিকালে ম্লেচ্ছ প্রবল। তাহারা অনাচারী ও সতত গো-ব্রাহ্মণের হিংসা করিয়া থাকে। কিরূপে ইহাদিগের উদ্ধার হইবে, তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণে বড় ক্লেশ হয়।"

ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"প্রভো! সত্য বটে, যবনগণ মহা সংসারাসক্ত; সত্য বটে, তাহারা গোহত্যাকারী, দুরাচারপরায়ণ; কিন্তু তথাপি উহারা সহজেই মুক্তি লাভ করিবে। উহারা যে কথায় কথায় 'হারাম' শব্দ উচ্চারণ করে, তাহার ভিতরে রাম-নামের আভাস রহিয়াছে। এই নামাভাসেই তাহাদের উদ্ধার হইয়া যাইবে। নামের শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।"

"যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে,
হারাম! হারাম! বলি কহে নামাভাসে।
মহা প্রেমে ভক্ত কহে হা রাম! হা রাম!
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে তাহা হয় নামাভাস,
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

এ স্থলে হরিদাসঠাকুর নৃসিংহপুরাণের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন।

"দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

অর্থ।—যখন বরাহদন্তে আহত হইয়া ম্লেচ্ছ 'হারাম' 'হারাম' উচ্চারণ করিয়াই মুক্তি লাভ করে, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রামনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ঠাকুর হরিদাস পুনরপি বলিলেন—"অজামিল আসন্নমৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পুত্রের নাম ধরিয়া নারায়ণ-নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই—সেই নামাভাসেই তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ,
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

অর্থ।—অজামিল মহাপাতকী হইয়াও পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামগ্রহণ করিলে যে জীব বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে আর কথা কি?

"নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব,
ব্যবহিত হৈলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব।"
(শ্রী চৈঃ চঃ)

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"
(পদ্মপুরাণ)

অর্থ।—ভগবানের নাম যাঁহার বাগিন্দ্রিয়ে, স্মরণপথে, অথবা কর্ণমূলে উদিত হয়, অর্থাৎ যিনি ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারণ করেন বা মানসে স্মরণ করেন অথবা কর্ণে

শ্রবণ করেন, এই একমাত্র নামই তাঁহাকে উদ্ধার করে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নামের বর্ণ শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবহিত অথবা ব্যবধানরহিত, যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে ফলের তারতম্য হয় না। কিন্তু যদি এই নাম দেহ-ধন-জনাসক্ত পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে, হে বিপ্র! এরূপ স্থলে নাম শীঘ্রই ফলজনক হয় না, অর্থাৎ একটু বিলম্বে হয়।

হরিদাসঠাকুরের নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকার জলন্ত বিশ্বাসের কথাসকল শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরায় ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"হরিদাস! এই পৃথিবীতে অগণ্য অসংখ্য জীব ও স্থাবরজঙ্গম যত কিছু আছে, সে সকলের মুক্তি কিরূপে হইবে?"

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম,
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

তদুত্তরে হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"প্রভো! সে ব্যবস্থা তুমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছ। তুমি যে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহাতেই স্থাবরজঙ্গমের উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। জীবগণ তোমার শ্রীমুখের হরিধ্বনি শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছে, আর স্থাবরসকলও সেই ধ্বনির তরঙ্গস্পর্শেই উদ্ধার পাইয়াছে। তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ঝারিখণ্ডের অরণ্যপথে যে কত হিংস্র পশুকেও কৃষ্ণনামে কাঁদাইয়াছিলে, নাচাইয়াছিলে, সে সব কাহিনী আমার অবিদিত নাই।

"হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার,
স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার।
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন,
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ।
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়,
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়।
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন,
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন।
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন,
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

জীবন-প্রহসন

এই অবিরাম অফুরণ জনস্রোতের জীবন-সমষ্টির মধ্যে আপনার জীবনটা কখন বা ভাবি বড় ছোট্ট, বারিবিন্দুবৎ নগণ্য; মিশে যেতে পার্‌লেই সিন্ধুত্ব প্রাপ্ত হব। আবার কখন বা ভাবি নগণ্য কিসে? মিশে যাওয়া কেন? শিশিরকণাও ত এ বিপুল বিশ্বে অযথা আসেনি। চৈতন্যস্বরূপে তারও যে আধিপত্য আছে; সেও ত বিচেতনে চেতনা আন্‌তে জানে। তবে? তবে তোমার সিন্ধুর না হয় শক্তি অপরিমেয়, অপরিসীম! অগণ্য অজস্র প্রাণী তাতে আশ্রয় লয়েছে, তাতে জীবনধারণ কর্‌ছে। মান্‌লাম সবই। কিন্তু ঐ যে পায়ে তলায় পতিত পত্র, তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা ত আর সিন্ধুর সামর্থ্যে নাই! তখন যে চোখ পড়ে তোমার ঐ অণুপ্রমাণ শিশিরকণার উপরে! চক্ষে তারে মালুম হয় বা না হয়, কার্য্য তার কারও অগোচর ত নয়।

তোমরা হয় ত বল্‌বে, এই বিন্দুত্বে থাকার আলগোছ ভাব, বড় দৃপ্তভাব মোটে ভাল নয়। আমি কিন্তু তা মানি না। নীহারকণাকে নজীর রেখে জীবন-পরিচালন, সে তো ক্ষণজন্মার কাজ! আমার তোমার কি? তবু প্রশ্ন আসে, ছাড়ান যায় না, "সিন্ধুত্বেই মিশি? কি শিশিরকণাতেই আট্‌কা থাকি?" দেখ্‌ছি, সিন্ধু বিরাট বিপুল, লয়ক্ষয় তাতে নাই। শিশিরের বিলয় আছে, তবে সে বিরচনাও জানে। দুই লোভনীয় বরণীয়! কিন্তু তুমি ভুলে যাও যে, এখানে তোমার আত্ম-ইচ্ছায় কর্ম্ম নয়। ঐ অন্তর-মধ্যস্থিত মন্দির হ'তে কার যেন সাড়া পাই সারাক্ষণ; কার যেন নির্দ্দেশ শুনছি অহরহঃ। অথচ সাক্ষাৎ নাই—প্রহসন না ত কি? কে এই শিল্পী? কি তার উদ্দেশ্য? কিসে তার প্রতিষ্ঠা? জান্‌তাম যদি, ছেড়ে দিতাম আমার বিন্দুত্ব, সিন্ধুত্ব সকলই তার হাতে।

জানি না যে! তাই ত অন্তর ছেড়ে বাইরে এসে প'ড়েছি। যেচে যেচে মাঙ্‌ছি বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবারই কাছে—"কে দিবি গো ব'লে মোর পরিণতির পন্থা।"

এ ক্ষেত্রে শিশুর কাছে শিখি ভাল, কেন না, সে ভড়ং জানে না, ভরে দেয়। কৈশোরের কোমল প্রাণের ছায়া পড়ে স্বচ্ছ, কিন্তু দেখ্‌বে কে? চোখ যে তোমার ঝাপ্‌সা! শ্মশানের ধোঁয়া আর ভস্মরাশির রজঃকণা যে তার মাথা খেয়ে রেখেছে। তখন পরিণত জীবনের বিস্তব্ধতার কাছে আপনার পরিণতি জান্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! সে প্রাণ যে জড়বৎ নিস্পন্দ! নির্ব্বাক্!

অথচ সেই যে বেরিয়েছি, আর ফির্‌বার নাম নেই। যেন পক্ষবিস্তৃত পক্ষীর

মত! প্রভেদ, উড়্তে জানি না, উড়্তে পারি না। পার্বই বা কেমন ক'রে? আমি যে এক দেহপিণ্ডকে ধারণ ক'রে রয়েছি, উড়ন্ত হাল্কা ভাব ত আমাতে আস্তে পারে না। যদি বা এই দেহের আশ্রিত হ'তে পার্তাম, হয় ত বা উড়্তে পার্তাম। তবে কি আমাতে পতঙ্গেরই প্রকৃতি? ধাঁ ক'রে ছুটে গিয়ে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়া? তা ব'সে পড়া এদের সাজে ভাল। এরা যে রূপের মালেক। রূপ ছড়িয়ে রূপরাজার হাট বসিয়েছে, এদের বিকি-কিনি চলে জোর। কিন্তু আমার যে কদাকৃতি! কুৎসিত মূরতি! আমার কাছে ভিড়্বে কে? আমি বেচ্বই বা কি? কিন্বই বা কি? তবে কি পশুসম মতি—যত হিংস্রের আকার? কেবলি ঘা বসাবার মত্লব, অহেতুকী হিংসা? লাভ অন্তর্জ্বালা, দৈহিক গ্লানি।

আমি বুঝি না কিছু! আমি বুঝ্তে পারি না কিছু! ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এত পদার্থ থাক্তে আমার প্রতিকৃতি মিলে না, এও কি হয়? এ যেন কিছু এর, কিছু তার, বাদবাকি একটা মহাশূন্যের মধ্যে ছুটেছে। তাই ত এ যাচ্ঞা, এই ভিক্ষু-বৃত্তি! এতে আমাকে কতখানি খাটো ক'রে দেয়, ভাব দেখি! আমি ত আর ভুঁই-ফোঁড় একটা যা তা নই! আমার যে আদি আছে, অন্ত রয়েছে, আমার যে স্থিতি নিশ্চিত, বিলয় অবধার্য্য। তবে আমি প্রাণ ভ'রে ধরি কাকে? আমার বিন্দুতে যে অধিকার, সিন্ধুতেও সে অধিকার! কে আমায় সে অজানাটুকু জানিয়ে দিবে? জন্ম ইস্তক ত আঁক্ড়ে ধরেছি সর্ব্বপ্রকার আকারকে, আমার অন্তর-নিহিত শূন্যতা আমাকে এ পথ ধরিয়ে দিয়েছে। শূন্যতার নাকি আত্মস্বরূপ নাই, তাই সে আকারকে স্বতঃ ভজনা করে। অনাদিকাল থেকে এই যা নেই, তা পাওয়ার সাধ মজ্জাগত হয়ে আছে, ঐ প্রাণী, মহা প্রাণী, জীব, শিব সবারই মধ্যে। নয় ত নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিখিলপতি হয়ে তারই সৃষ্ট আকারের মাঝে আপনার বিকাশ মাঙ্ছে কেন সেই তৎকাল থেকে? তাই ত চক্ষু খুলে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুতে তারই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখ্তে পাই। সে প্রতিবিম্ব যে আবার তোমার আমার জীবনকে নির্দ্দেশ করে। প্রহসন না ত কি?

এখন দেখি, তুমি তবে ছাড়া কোন্ কালে? এই ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোম সকলই যে তোমার আত্মধন নিত্য বস্তু। তারা ছাড়া তোমার স্পন্দন নাই, তুমি ছাড়া এদের স্পন্দন নাই। এই পরস্পরের স্পন্দনটুকুই যে জীবন, এতে করেই তো বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্যেই বিন্দু তোমায় যেমন ডাকছে, সিন্ধুও তোমায় তেমনি ডাকছে। যদি কান পেতে শুনতে পার, যদি সে শ্রবণ পেয়ে থাক, তবে একদিন এই ডাক ছাড়িয়ে সেই ডাকের বস্তুর সন্ধান পাবেই। তখন সীমার মধ্যে বাস ক'রে তুমি ভূমাতে বিলীন হয়ে রবে। একা বিন্দু

তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না, তুমি যে তখন মহাসিন্ধুর একেবারে আপনার। তাই ত সোহাগে গর্জ্জে গর্জ্জে, দুহাত বাড়িয়ে সিন্ধু আলিঙ্গন কর্‌ছে তোমার ঐ ক্ষিতিকে। ক্ষিতি হ'তে সে আলিঙ্গনের পরশ কেড়ে নিয়ে মরুৎ তা ছুড়িয়ে দিচ্ছে ঐ ব্যোমে। ব্যোম সে পরশ-রস পান করে তার তেজোময় জ্বালা জুড়াবে ব'লে। তবে তুমি রইলে না কোন্‌খানে? তোমার ঐ সর্ব্বব্যাপী স্থিতিকে বাধা দেয়, হেন সাধ্য কার? তোমার রসের ধারায় তাণ্ডবনৃত্য চলেছে,—ত্রিদিবে।

সেই নৃত্যভঙ্গে প্রাণী মহাপ্রাণীর হাসন-কাঁদন প্রহসন চলেছে অষ্টপ্রহর। চারা নাই, যাবৎ জীবন, তাবৎ কাঁদন, যাবৎ প্রাণ, তাবৎ হাসন। মাঝে মাঝে ভাবি, ক্ষেপে যাব নাকি এই হাসি-কান্নার হেঁপায় প'ড়ে। আমি যে ভজনা করেও কেঁদে মরি, ভজনা পেয়েও কেঁদে মরি, বলি "বিশ্বরাজ হে! কেন ডাক সখা ব'লে আর?" আমি যে নিদারুণ লাজে মরি! দেখে তোমরা হাস্‌ছ। তা হাস্‌বেই ত। দুই প্রাণের যে দুই বুঝ, কোটী প্রাণের কোটী ব্যবস্থা। ছলাকলার অবধি নাই। আমি বিন্দুকণা, সিন্ধুত্বের আস্বাদ ত এইখানেই পাই। অসীম-সসীমের গোল ত এইখান থেকেই সুরু। তখন কানে শুনি শুধু এক বাণী— "নেতি নেতি নেতি; নয়, নয়, নয়," "বিন্দু নয়, বিন্দু নয়, বিন্দু নয়।" "নেতি নেতি নেতি" "নয়, নয় নয়" "সিন্ধু নয়, সিন্ধু নয়, সিন্ধু নয়।" তুমি এ দুইয়ের কিছুই নয়। তখন অন্তরমধ্যে এ কি নির্দ্দেশ! "তৎসর্ব্বম্, ত্বমেকম্," "তৎসর্ব্বম্, ত্বমেকম্" তুমি তখন তন্ময়, সর্ব্বময়, তন্ময়!

শ্রীজগদম্বা দেবী।

গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য

৪

এই পর্য্যন্ত গেল প্রকৃত প্রেমের প্রভাবে পতিতার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত। আর এক শ্রেণীর দৃষ্টান্তে আর একটি তত্ত্ব প্রকটিত। পতিতা পঙ্কিল জীবন যাপন করিয়াও নারীর বিশিষ্টতা একেবারে হারায় না, তাহার মসীময় চরিত্রেও অতর্কিত-ভাবে একটা শুভ্র রেখার আবির্ভাব হয়, কালো মেঘের কোলে অকস্মাৎ চাঁদের আলো একটু ঝিকিমিকি করে (silver liuing of a cloud), মন্দর ভিতরেও ভালর বীজ থাকে (some scul of good in things evil), এক শুভমুহূর্ত্তে অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করে—কতকগুলি গল্পে এই তত্ত্বটি প্রকটিত। বলা বাহুল্য, ইহাও romantic movement, তথা humanitarian মতের ফল। আমাদের হৃদয়ের প্রসারণের উদ্দেশ্যে—ঘৃণার পাত্রও সম্পূর্ণ ঘৃণার পাত্র নহে, তাহার ভিতরেও শ্রদ্ধা করিবার বস্তু পাওয়া যায়,—ইহাই বুঝান উল্লিখিত সাহিত্যধারার প্রয়াস। এই জন্যই হালের লেখক জর্জ্জ ম্যাকডোনাল্ড স্বপ্রণীত Robert Falconer' আখ্যায়িকায় বলিয়াছেন :—

"The devil could drive woman out of Paradise but the devil himself could not drive paradise out of a woman." "She may have her ages of chaos, her centuries of crawling slime, yet rise a woman at last."

আমাদের সাহিত্যেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—"সংসারে পিশাচী কি নাই ? নাই যদি, তবে পথে ঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাহাদের ? ………… ……তবুও কেমন করিয়া মনে হয়, এ সকল তাহাদের বাহ্য আবরণ ; যখন খুসি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে।" (শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী ১ম পর্ব্ব।) "বিশ্বাস কোরো, সকলের দেহতেই ভগবান্ বাস করেন এবং আমরণ দেহটা তিনি ছেড়ে চ'লে যান না।" …………"নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না।" (আঁধারে আলো।)

এক্ষণে এই ভাবে অনুপ্রাণিত কয়েকটি পতিতা-চিত্রের দৃষ্টান্ত দিই।

অন্যত্র বলিয়াছি, (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, 'মা'—প্রবন্ধ), "পাষণ্ড প্রণয়িকর্তৃক প্রবঞ্চিতা ও পরিত্যক্তা সন্তান-সম্ভাবিতা অবিবাহিতা নারী (Fantine) কি প্রকারে কন্যাপ্রসবের পর দারিদ্র্যবশতঃ শিশুকন্যার (Cosette) জীবনরক্ষার জন্য নিজের সৌন্দর্য্যের উপাদান কুন্দদন্ত ও চাঁচর চিকুর অম্লানবদনে বিক্রয় করিল, পরন্তু দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে অনন্যগতি হইয়া মাতৃভাবের প্রবল উত্তেজনায় নারীর সর্ব্বস্বধনে জলাঞ্জলি দিয়া রূপোপজীবিনীর জঘন্য জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইল, দারিদ্র্যের তাড়নে মাতৃত্বের মহান্ আদর্শের কাছে সতীত্বের পবিত্র আদর্শও ক্ষুণ্ণ করিল। * ভিক্টর হিউগো Les Miserables' অর্থাৎ 'দরিদ্রের কাহিনী'তে এই যে করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়া নরকের ভিতর স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় গভীর সমবেদনায় আলোড়িত হয়।" আবার উক্ত লেখকের The Haunchback of Notre Dame আখ্যায়িকায় দেখা যায়, একটি নারী দারিদ্র্যের তাড়নে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু এই পথে সুখশান্তি হারাইয়া একটি শিশুসন্তান গর্ভে ধারণ করিবার জন্য আকুল হইয়াছিল, ভগবৎকৃপায় তাহার সে সাধ পূর্ণ হইলে সে সন্তানের মুখ দেখিয়া, তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া সুখশান্তি ও আনন্দ পাইল। তাহার পর (gypsies) বেদিয়ারা তাহার শিশুকন্যাটি হরণ করিলে সে শোকে মুহ্যমান হইয়া সংসারত্যাগিনী হইল। শিশুর একপাটি জুতা তাহার একমাত্র অবলম্ব ও সান্ত্বনাস্থল ছিল। এই আখ্যায়িকায় বহু বৎসর ধরিয়া তাহার গভীর নৈরাশ্যের এবং শেষে কন্যাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত অত্যন্ত করুণ ও প্রাণস্পর্শী।

বাঙ্গালা সাহিত্যে অবিকল এই প্রকারের চিত্র না থাকিলেও পতিতার হৃদয়ে মাতৃভাবের বিকাশের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষের ('শুভদৃষ্টি' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত) 'জয়মাল্য' গল্পে অভিনেত্রী বেশ্যা পরের শিশুপালনের ভার পাইয়াছে, এই ভূমিকাগ্রহণ করিয়াছিল। অভিনয়ের পর শিশুটিকে ফিরাইয়া দিতে তাহার কষ্টবোধ হইল তাহার শূন্যজীবনে সুপ্ত মাতৃভাব জাগিল, একটি শিশুকে বুকে পাইবার জন্য তাহার আকুলতা হইল। পরে সে শুভাদৃষ্টবশতঃ সত্য সত্যই এক মরণোন্মুখী ভিখারিণীর শিশুকে বুকে পাইল, তাহার স্নেহের ক্ষুধা মিটিল। (শিশুটিকে সুশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতে সে যে বাধা পাইল, তৎপ্রসঙ্গে গল্পলেখক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন।)

---

* ভারতবর্ষে প্রকাশিত (চৈত্র ১৩২৩)-'দয়ার মূল্য' গল্পে অক্ষম স্বামীর চিকিৎসার জন্য সাধ্বী স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া নিজদেহ বিক্রয় করিল এবং তাহাতেও স্বামীকে বাঁচাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল, এই কল্পনায় হৃদয়দ্রাবী করুণরস থাকিলেও ইহা যেন কেমন কেমন ঠেকে।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (কার্ত্তিক ১৩২৫) 'প্রত্যর্পণ' গল্পে বেশ্যার প্রণয়ী বেশ্যাকে একটি শিশুর জন্য লালায়িত দেখিয়া তাহার স্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাহাকে একটি শিশু চুরি করিয়া আনিয়া দিল। বেশ্যা শিশুটিকে পাইয়া কৃতার্থ হইল, মাতৃত্বের আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে শিশুর মাতাকে সন্তান-শোকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত দেখিয়া চোর মায়ের ছেলে মাকে ফিরাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিল। বেশ্যা হৃদয়ের তুমুল দ্বন্দ্বের পর শেষে সে প্রস্তাবে সম্মত হইল। মাতৃভাব ও ন্যায়-পরতার এই দ্বন্দ্ব প্রাণস্পর্শী।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত (চৈত্র ১৩২৫) 'রাণী' গল্পে দাসীর ক্রীত একটি অনাথা শিশুকন্যা দেখিয়া নর্ত্তকী রাণীর হৃদয়ে সুপ্ত মাতৃভাব জাগিল, শিশুকে সে বুকে তুলিয়া লইল। তাহার পর সেই শিশুর কল্যাণে তাহার জীবনের গতি ফিরিল, সে পাপ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সৎপথে আসিল। এমন কি, মেয়েটির দখল লইয়া পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িয়া, লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া অনন্যোপায় হইয়া বহুকাল-পরিত্যক্ত পিতৃভবনে ফিরিয়া গিয়া কুলত্যাগিনী পিতার চরণে শরণ লইল।

এ তিনটি স্থলেই পরের শিশুকে উপলক্ষ করিয়া পতিতার হৃদয়ে মাতৃভাব জাগিয়াছে, এবং তাহার প্রভাবে অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে। নিম্নের দৃষ্টান্তটিতে নিজে সন্তান-জননী হওয়াতে পতিতার হৃদয়ে মাতৃভাবের প্রভাবে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেরফের' আখ্যায়িকায় রূপজীবিনী ক্ষণপ্রভা কন্যা বিদ্যুতের জন্ম হইতেই নিজের আচরিত বৃত্তির জন্য লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, এবং যাহাতে কন্যাকেও এই পাপব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে না হয়, অথচ কন্যা মাতার অসৎপথে উপার্জ্জিত প্রভূত ধনের অধিকারিণী হইতে পারে, প্রথম হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিল। কন্যার জ্ঞান-সঞ্চারের বয়স হইলেই সে কন্যাকে নিজের পাপ-ব্যবসায়ের কথা জানিতে দিল না, তাহাকে সুশিক্ষার জন্য ভাল বিদ্যালয়ে ও বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করিয়া দিল, এবং ছুটির দিনে কন্যার সহিত একত্র বাসের জন্য ভদ্রপল্লীতে একটি বাড়ী লইল। এত সাবধানতা-সত্ত্বেও কিন্তু কন্যা একদিন ঘটনাক্রমে মাতার কুৎসিত জীবন প্রত্যক্ষ করিল, মাতা (ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) সেই লজ্জায় আত্মহত্যা করিল। কন্যা মাতার প্রদত্ত পাপের ধন গ্রহণ করিল না, শিক্ষয়িত্রী হইয়া সৎপথে অর্থার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। (একজন সচ্চরিত্র ও উদারহৃদয় যুবক পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যুৎকে ভালবাসিত, সে বিদ্যুতের জন্মকথা জানিয়াও তাহাকে বিবাহ করিল)। ক্ষণপ্রভার এই মাতৃদায়িত্ব জ্ঞানের ও মাতৃস্নেহের চিত্র মনোরম।*

---

* 'হেরফের' আখ্যায়িকার এই অংশের বার্ণাড শ'এর Mrs. Warren's Profession

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, পতিতার এরূপ মাতৃদায়িত্বজ্ঞান নিতান্ত কবিকল্পনা নহে। Truth is stan_er than fiction সত্য কল্পনা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, থাকমণি নাম্নী কুলটা যুবতী নিজের পাপজীবনের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, যাহাতে তাহার শিশুকন্যাকেও যথাকালে এই পথে দাঁড়াইতে না হয়, তজ্জন্য শাস্ত্রীমহাশয়কে শিশুকন্যাটির ভার লইতে আকুল-ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল। শিশুকন্যাটি তখনও মাতৃস্তন্য ছাড়ে নাই, তথাপি সে মায়াত্যাগ করিয়া কন্যাকে সৎ আশ্রয়ে রাখিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

'হেরফের' লইয়া আর অধিক হেরফের করিব না। এক্ষণে অন্য কথা বলি। 'হেরফের'র আলোচনার পূর্ব্বে যে তিনটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছি, সে তিনটিতেই একটা অতর্কিত ঘটনার প্রভাবে পতিতার হৃদয়ের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের—সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। এইরূপ অতর্কিত পরিবর্ত্তনের আর কতকগুলি অন্য প্রকারের দৃষ্টান্ত নিয়ে দিতেছি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Reverie of poor Susan' কবিতায় দেখা যায়, পল্লীবালা সহরে আসিয়া বিপথগামিনী হইয়াছে. সহরের রাস্তায় একটি খাঁচার পাখীর গানে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, পল্লীর পবিত্র ও সরল জীবনের স্মৃতিতে সে তন্ময় হইল। কিন্তু হায়! সে পতিতা, কলঙ্কিতা, পল্লীমাতার কোলে ফিরিবার আর তাহার পথ নাই। (ল্যাম্বের পরামর্শে কবিতার শেষ ষ্ট্যান্‌জাটি পরিত্যক্ত হয়, তজ্জন্য নারীটি যে কলঙ্কিনী, তাহা আর পাঠক ধরিতে পারেন না)।

শুনিয়াছি, মোপাসাঁর একটি গল্পে—কয়েকজন পতিতা নারী স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য রাজধানী প্যারিস ছাড়িয়া সহরের উপকণ্ঠে বনভোজনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু যেমন

নাটকের সহিত কতক পরিমাণে ঐক্য ও কতক পরিমাণে অনৈক্য দেখা যায়। উক্ত নাটকে বেশ্যাকন্যা Vivieর মাতার জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মাতার জঘন্য বৃত্তির প্রতি ঘৃণা, মাতার পাপপথে অর্জ্জিত প্রভূত ধন লইতে অসম্মতি ও সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের সঙ্কল্প বিদ্যুতের চরিত্রেও দেখা যায়। পক্ষান্তরে Vivie প্রণয়াস্পদকে বিবাহ করিতে নারাজ, প্রণয়ীও তাহার জন্মকথা জানিয়া বিবাহে অনিচ্ছুক—এ ক্ষেত্রে 'হেরফেরে' বর্ণিত ব্যাপারের সহিত অনৈক্য। উভয়ের মাতার চরিত্রে সম্পূর্ণ প্রভেদ। Mrs. Warrenও কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সে সময়ে নিজের জীবনকথা কন্যার নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে ক্ষণপ্রভার মত উচ্চভাব ছিল না। পরে তিনি নিজ মুখেই কন্যাকে সকল কথা বলিয়াছেন এবং কন্যার মতিগতি দেখিয়া তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হই লেন। ইহা ছাড়া উভয় পুস্তকের আখ্যানবস্তুতে আরও অনেক অনৈক্য আছে।

তাহাদের পূর্ব্বজীবনের পরিচিত পল্লীদৃশ্যগুলি নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল, অমনি তাহারা পাপ-জীবনের কথা ভুলিয়া, স্ফূর্ত্তির কথা ভুলিয়া, আবার সেই পবিত্র সরল পল্লীজীবনের জন্য আকুল হইল—এইরূপ কল্পনা আছে।

যাহা হউক, এ দুইটি স্থলে পরিবর্ত্তন ক্ষণিকের জন্য। আমাদের সাহিত্যে কতকগুলি গল্পে একটি অতর্কিত ঘটনায় চরিত্রের চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' নামক পুস্তকে মুদ্রিত 'পতিতা' কবিতায় এই প্রকারের অতর্কিত পরিবর্ত্তনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। রামায়ণের পাঠকবর্গ জানেন, নারীজাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ঋষিবালক ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য কতকগুলি বারাঙ্গনা প্রেরিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে, তাহাদিগের মধ্যে একজনের, নগরের কৃত্রিম শোভা ছাড়িয়া স্বভাব-শোভার মধ্যে আসিয়া পড়াতে বহিঃ-প্রকৃতির পবিত্র প্রভাবে, তথা শুদ্ধশীল ঋষিবালকের নির্ম্মল প্রকৃতির প্রভাবে, বিশেষতঃ 'আনন্দময়ী মূরতি তোমার কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা' ঋষিবালকের পতিতা নারীকে দেবভ্রমে এই সম্বোধনের ফলে, পাপকলঙ্কিতা নারীর সুপ্ত নারীত্ব দেবীত্ব জাগিল, 'পতিতা'র কথায়

'আনন্দে মোর দেবতা জাগিল।'

'হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা বাজায়ে উঠিল বিজয়-ভেরী।'

'নিমিষে ধৌত নির্ম্মল রূপে বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।'

'জননীর স্নেহ রমণীর দয়া কুমারীর নব-নীরব প্রীতি।
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।'

পতিতার আরও কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। যথা,—

'আমি শুধু নহি সেবার রমণী মিটাতে তোমার লালসা-ক্ষুধা!
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।'

'ছেড়েছি ধরম তা ব'লে ধরম ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই।
নাহিক করম, লজ্জা সরম, জানিনে জন্মে সতীর প্রথা,
তা ব'লে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা।'

বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের ক্ল্যাসিক কল্পনার ভিতর রবীন্দ্রনাথের এইরূপ বৈচিত্র্য-সম্পাদন রোম্যান্টিক রীতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ('পরাণ মণ্ডল' পুস্তকে প্রকাশিত) 'না' গল্পে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, লেখক মহাশয় ছাত্রজীবনে (ছত্রাভাবে) বৃষ্টির জন্য না জানিয়া এক বেশ্যার দ্বারে আশ্রয় লইয়াছিলেন; বেশ্যা তাঁহাকে উপরকার ঘরে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলায় তিনি গভীর ঘৃণার সহিত 'না' বলিয়া তৎক্ষণাৎ বৃষ্টির মধ্যেই সে স্থান ত্যাগ

করিলেন। "এই ঘৃণা দেখিয়া বেশ্যার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, সে পাপজীবন পরিহার করিয়া বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। বহুদিন পরে হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে লেখক মহাশয়ের সহিত সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হইল ও তিনি উক্ত ইতিহাস শুনিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শিউলী' গল্পে (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৩) কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেববিগ্রহ-দর্শনে 'ঘৃণিতা পতিতা'র হৃদয়ে এমন পবিত্র গম্ভীর উদাত্ত-ভাবের উদয় হইল যে, সে সঙ্গী চটুলপ্রকৃতি প্রণয়ীর পুনঃ পুনঃ আহ্বান ও হস্তাকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করিয়া ভক্তিরসে ডুবিয়া গেল। ছোট্ট ঝরঝরে গল্পটি—বড় মিঠে। আরম্ভটি সুন্দর, একেবারেই গল্পের প্রাণের সুরটুকু ধরাইয়া দেয়।—'নীলিমা ঢাকিয়া যখন সজল বাদলে কাজল-মেঘের ঘোরঘটা পড়িয়া যায়, কাল আকাশ তখন আপন বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে ক্ষণিক আলো দেখায় কেন ? সে জানাইয়া দেয় যে, এই অকাল সাঁঝে অন্ধকারই তাহার যথাসর্ব্বস্ব নহে। অন্ধকারের ভিতর হইতেও যে আলো ফুটিতে পারে, সব সময়ে এটা আমরা মনে না রাখিয়া প্রকৃতির উপরে কঠিন অবিচার করি।' নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'উহারা ভাল হইতে চাহিলেও আমরাই (পুরুষেরা) উহাদিগকে ভাল হইতে দিই না।' এ সব ঘটনায় তাঁহার কথাটির সত্যতা উপলব্ধি হয়।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর (বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ১ম ভাগে) 'কেন' গল্পে কুলটা কালীঘাটে দৈবাৎ নিজ প্রণয়ীর অবহেলিতা পত্নীকে দেখিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিতা ও অনুতপ্তা হইয়া প্রণয়ীকে ত্যাগ করিল, সতী-সাধ্বীর সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিল। এই সঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' নাটকে অঙ্কিত শান্তার চরিত্রও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ('প্রেমমরীচিকা' পুস্তকে) 'কুলটা' গল্প অনেকটা পূর্ব্বোক্ত 'কেন' গল্পের ধরণের হইলেও তদপেক্ষাও মর্ম্মস্পর্শী। কুলটার প্রণয়ীর পত্নী বিসূচিকারোগগ্রস্তা কুলটাকে কাশীর রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলেন। পত্নী অবশ্য তাহার সহিত স্বামীর কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতেন না। কিন্তু কুলটা যখন জানিল, প্রাণদাত্রী কে, তখন সে এমন সতীলক্ষ্মীর সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিল। উপসংহারে গল্পলেখক বলিয়াছেন :—'সেই আত্মত্যাগে তাহার কলঙ্ক-কলুষিত জীবনের সকল কালিমা প্রক্ষালিত হইয়াছিল, শুভ্র সুন্দর, নারীহৃদয়ের মহত্ত্ব সপ্রকাশ হইয়াছিল। মৃত্যুর আলোকে তাহার জীবনের তমোরাশি বিদূরিত হইয়াছিল—সেই আলোকে পুণ্যপূত রমণীহৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।' ইংরেজ কবি হুডের কথায় আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে,—

'Touch her not scornfully;
Think of her mournfully,
Gently and humanly;
Not of the stains of her—
All that remains of her,
Now is pure womanly.'

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্য ও মিথ্যা' পুস্তকে 'লাবণ্য' গল্পে লাবণ্যের ঘৃণিত ব্যবসায়ে অপ্রবৃত্তি, তাহার রূপমোহিত ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে তাহার আপত্তি, ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবের সহিত সুরে সুর মিলাইয়া কীর্ত্তন গায়িয়া সে চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে আর 'তুহুঁ দীনদয়াল দীনবন্ধু' বলিয়া আকুলপ্রাণে পতিত-পাবনের শরণ লইতেছে, এই অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'হরিশ ভাণ্ডারী' পুস্তকে স্বামিসোহাগিনী 'দুর্গা' স্বামীর মনিব জমিদারের কুহকে ভুলিয়া কুলত্যাগিনী হয়। পরে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ক্রমেই পাপ-পঙ্কে ডুবিতে থাকে, শেষটা হরিশ ভাণ্ডারীর স্কন্ধে ভর করে। কিছুকাল পরে কিন্তু উভয়েরই নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তাহার পর পরেশ-নামক একটি বালককে হরিশও পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিল, দুর্গারও বালককে উপলক্ষ করিয়া মাতৃভাবের বিকাশ হইল। গ্রন্থকার বলিতেছেন:—"পরের ছেলের জন্য, পরের দুঃখের কথা ভাবিয়া এমন করিয়া চক্ষের জল বুঝি মায়ের জাতিই ফেলিতে পারে। দুর্গা কুল-ত্যাগিনী—দুর্গা রূপ বেচিয়া জীবনধারণ করিয়াছে; কিন্তু ভগবান্ যে তাহার সেই পাপকলুষ-পূর্ণ হৃদয়ের এক কোণে একটা কি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দুর্গাকে এই শেষ অবস্থায় ভগবানের পথে লইয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে এই পরেশ ছেলেটি আসিয়া তাহার হৃদয়ের পাষাণ-চাপা উৎস-মুখ হইতে পাথরখানি সরাইয়া দিল; আর সেই উৎসমুখে ভোগবতীধারা উৎসারিত হইয়া তাহার সমস্ত পাপকালিমা ধুইয়া লইয়া গেল, তাহার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় মহিমময়ী জননীর পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।" "যারা হঠাৎ প্রলোভন সংবরণ করতে না পেরে পাপের পথে যায়, তাদের কারও কারও হয় ত প্রকৃতপক্ষে ভয়ানক অনুশোচনা হয়, কিন্তু তখন ত আর তারা ফের্‌বার পথ দেখ্‌তে পায় না।···বাধ্য হয়ে পাপের পথে যেতে হয়। কিন্তু ঐ যে প্রথমকার অনুশোচনা, তা কিন্তু তাদের একেবারে যায় না। তারাই শেষে এই দুর্গার মত হয়।"

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খোলা চিঠি'তে (মানসী, ফাল্গুন ১৩২২) নায়িকা স্বামীর সহিত প্রকৃতির অনৈক্যের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। কিছুদিন পরে যৌবনের উদ্দামতায় প্রেমিকের সহিত গৃহত্যাগ করিল। যথানিয়মে প্রবঞ্চক প্রেমিক

তাহাকে ত্যাগ করিল। সে বাড়ীওয়ালীর অত্যাচারেও পাপ-ব্যবসায়-অবলম্বনে অনিচ্ছুক হইল। তাহার মত পতিতার উদ্ধার আছে, একজন যুবকের মুখে শুনিয়া সে আশ্বস্ত ও যুবকের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইল। ইহার পর সে বহুদিন স্বামীর প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক স্বামীর স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ আঁকড়াইয়া থাকিল, কিন্তু হৃদয়ের দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হইয়া শেষে যুবকের নিকট অঙ্গুরীয়কের সহিত আত্মসমর্পণ করিল।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ('মধুপর্ক পুস্তকে')'কুসুম'গল্পে বেশ্যা-কন্যা কুসুম ট্র্যামগাড়ী হইতে পতিত আহত মূর্চ্ছিত অপরিচিত পুরুষের সেবা করিল ও চিকিৎসা করাইল—নারীসুলভ করুণার প্রেরণায়।* স্বার্থপরায়ণা মাতার পরামর্শে সে রোগীকে পরে হাঁসপাতালে দিতে বাধ্য হইল, সেখানেও সে রোগীকে দেখিতে গেল। 'আপন জীবনের মলিনতা কুসুমকে সব সময়েই কাতর করিয়া রাখিত। এই মলিনতার ভিতরে থাকিয়াও সে যে একটা ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও মন তার সন্তোষ ও পুলকে পুরিয়া উঠিতেছিল।' পক্ষান্তরে আরোগ্যের পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন সব কথা জানিলেন, তখন কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সেই উপকারিণী দয়াময়ীকে 'আমাকে তোর হাতের জল খাওয়াইয়া জাত মারিয়াছিস্' বলিয়া তিরস্কার করিলেন। গল্প-লেখক এইরূপে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দয়া-ধর্ম্মের সহিত আচার-অনুষ্ঠানের গোঁড়ামির (Contrast) বিরোধিতা ফুটাইয়াছেন। কুসুমের মাতার টুকরা চিত্র বাস্তব (Realistic), দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—মাতা ও কন্যার চরিত্রের (Contrast) বিরোধিতা-প্রদর্শনের জন্য ও গল্পের সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয়।

শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'তপস্যার ফল' আখ্যায়িকায় বেশ্যা গিরিবালা যখন তাহার প্রণয়ী নগেনের মুখে শুনিল যে, পাষণ্ড নগেন বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা ললিতার মিথ্যা কলঙ্ক আদালতে পর্য্যন্ত রটাইতে প্রবৃত্ত, তখন তাহার মনে পড়িল যে, তাহারও একজন আত্মীয় এইরূপে তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণায় প্রণয়ীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল, (নগেনের ষড়্‌যন্ত্র ধরিয়া দিবার জন্য ললিতার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল) এবং ঘৃণিত বৃত্তি ছাড়িয়া দিল। আখ্যায়িকাকার চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য এবং পূর্ব্বপ্রকৃতি ও পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির বিরোধিতা (Contrast) ফুটাইবার জন্য গিরিবালার পাপ ব্যবসায়ের ছলাকলার এবং তাহার স্ব-ব্যবসায়ে লিপ্তা বিমলার এক টুকরা বাস্তব (Realistic) চিত্র দিয়াছেন।

---

* প্রকৃত জীবনেও যে এই শ্রেণীর নারীর এরূপ করুণা ও পরোপচিকীর্ষা অসম্ভব নহে, তাহা ইংরেজ লেখক ডি কুইনসির Confessions of an Opium-eaterএ উক্ত লেখকের প্রতি দয়াবতী পতিতা নারী Annএর বৃত্তান্তে বুঝা যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের 'জীবন-নাট্য' গল্পে (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) যুবতী বিধবা সঙ্গীতসাধনায় মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াও প্রতারক সঙ্গীতসাধকের কুহকে পড়িয়া বিপথগামিনী হইল; তথাপি সে সঙ্গীতসাধনার জন্য ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া এক ওস্তাদের শরণ লইল এবং অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া ওস্তাদের গুরুদক্ষিণা-প্রার্থনায় গভীর সংযমের পরিচয় দিল।

৫

প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, সাহিত্যে রোম্যান্টিক রীতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে humanitarianism) মানবিকতা প্রভৃতি সমাজনীতির ব্যাপারও কার্য্য করিতেছে; এবং ইহার ফলে যেমন একদিকে সমাজনীতির তরফ হইতে পতিতাদিগের উদ্ধারের (reclaiming) চেষ্টা হইতেছে, তেমনি অপরদিকে সাহিত্যধারার তরফ হইতে পতিতাদিগের চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আবার দ্বিতীয় অংশের এক স্থলে বলিয়াছি যে, "আজকাল কাব্যনাটকের মারফত সমাজ-সংস্কারের, সমাজের অনাচার-অত্যাচার-প্রদর্শনের ও সেই সকল অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবিধানের প্রয়াস হইতেছে, সামাজিক-সমস্যা-অবলম্বনে কাব্যনাটক-রচনার প্রথা প্রচলিত হইতেছে (এ গুলিকে problem play, problem novel বলে)।" এই প্রথার অনুসরণে আজকালকার সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইতেছে; সেই সকল চিত্রে এই সমস্যাটির আলোচনা করা উদ্দেশ্য:—যদি কোন নারী এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় বিপথগামিনী হয়, কিন্তু পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তা হয় ও সৎপথে ফিরিতে আগ্রহান্বিতা হয়, অথবা প্রবলের জবরদস্তিতে বিনা ইচ্ছায় ও বিনা সম্মতিতে কোন নারীর দেহ অশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে? এবং সমাজ যদি তাহাদিগকে নিজ অঙ্কে স্থান না দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সারাজীবন পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার জন্য পাপভাজন কে? এই শ্রেণীর নারীর চিত্র (ইহারা অনেকেই তখনও বেশ্যার পদবীতে অধোনীত হয় নাই) খ্যাতনামা গল্পলেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন 'বিশুদাদা,' 'অভাগী' এবং 'ঈশানী' আখ্যায়িকায় এবং 'কোথায় আমরা যাই?' নামক ছোট গল্পে (মানসী, ফাল্গুন ১৩২০) সহৃদয়তার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন এবং ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিকতার সহিত উল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। 'নারায়ণে' প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) 'বন্ধ দরজার' গল্পও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শেষকথা

এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ হইল। দৃষ্টান্তের সংখ্যা দেখিয়া হয় ত পাঠক-সম্প্রদায় 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এত অধিক দৃষ্টান্ত জড় করিয়াছি। উহা হইতে পাঠক-সম্প্রদায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চিত্র সাহিত্যের আসরে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। তথাপি হলপ করিয়া বলিতে পারি না যে, গত কয়েক বৎসরে যত গল্পের বহি ও মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে, সবই পড়িয়াছি। সুতরাং ইহা ছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত যে লেখককে এড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহা হইতেই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা (tendency) ঝোঁক বেশ ধরিতে পারা যাইতেছে। শুধু জনকতক অপরিণত-বুদ্ধি যুবা যদি এই ধরণের গল্প লিখিয়া আসর জমাইতেছেন এইরূপ হইত, তাহা হইলে না হয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বা চাপিয়া যাওয়া যাইত ; কিন্তু যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল, প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন, এই শ্রেণীর সাহিত্যের নিদান-নির্ণয়ের প্রয়োজন। সত্য বটে, এ বিষয়ে যেন কতকটা বাড়াবাড়ি হইতেছে। এইরূপ গল্পের অত্যধিক সংখ্যা তাহার একটা প্রমাণ। 'গোড়ার কথা'য় বলিয়াছি, সুদূর মফস্বল হইতে প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য ও ছাত্র-পরিচালিত কলেজ ম্যাগাজিনেও এইরূপ গল্প বাহির হয়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন কোন স্থলে বাড়াবাড়ি দেখিয়া Romantic Movementএর এরূপ বিবর্ত্তনকে বাস্তবিকই Sickly, Unhealthy, Morbid অস্বাস্থ্যকর—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে ইচ্ছা করে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেক পাঠক ও সমালোচক হয় ত এই প্রবন্ধের উপর—'প্রবাসী'র সমালোচক যেরূপ 'জয়মালা' গল্পের উপর এবং বর্ত্তমান লেখক যেরূপ 'ডালিম' গল্পের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন—সেইরূপ বিরক্ত হইবেন এবং এ সব জুগুপ্সিত বিষয় লইয়া আলোচনা ও অনুসন্ধান করা সুবুদ্ধি, সুরুচি ও সুনীতির কার্য্য নহে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। তবে বর্ত্তমান সমালোচকের বক্তব্য এই যে, ইহাতে যদি কোন দুর্নীতি বা কুরুচি থাকে, তাহার জন্য দায়ী কবি, নাটককার ও আখ্যায়িকাকারগণ। সমালোচক তাঁহাদের রচনার বিশ্লেষণ করিতেছেন, নূতন সৃষ্টি করিতেছেন না, সাহিত্যের ভাণ্ডারে যাহা পাইয়াছেন, তাহারই গতি-প্রকৃতি বুঝাইতেছেন, অস্বাস্থ্যকর বস্তু ভাণ্ডারে আমদানি করিতেছেন না। বরং এই সব আপাত-দৃষ্টিতে নিন্দনীয় চিত্রে কি সূক্ষ্মতত্ত্ব-প্রকাশের প্রয়াস আছে, তাহা পাঠক-সম্প্রদায়কে প্রণিধান করিতে সাহায্য করিতেছেন। ফলতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন

কোন চিত্র কুৎসিত, অশ্লীল ও সমাজের অনিষ্টকর হইলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চিত্রগুলি সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। কচিৎ কোথাও একটু বাড়াবাড়ি হইলেও ইহা যে মোটের উপর Romantic Movement ও Humanitarianism এতদুভয়ের প্রভাবের ফল, এবং ইহার উদ্দেশ্য যে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা পরিহার-পূর্ব্বক প্রসার-বৃদ্ধি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এ কারণেই উল্লিখিত শ্রেণী-দ্বয়ের ভাল দিক্‌টা প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের প্রারম্ভে তাহা বিশদভাবে বলিয়াছি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। উপসংহারে পাঠকবর্গকে তিনটি কবিবাক্য স্মরণ করাইয়া দিই :—

'There is some soul of good in things evil,
Would men observingly distil it out.
Shakespeare,

'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'

"Then gently scan your brother man,
till gently sister woman ;
Though they may gang a kennin wrong
To step aside is human.—Burns.

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
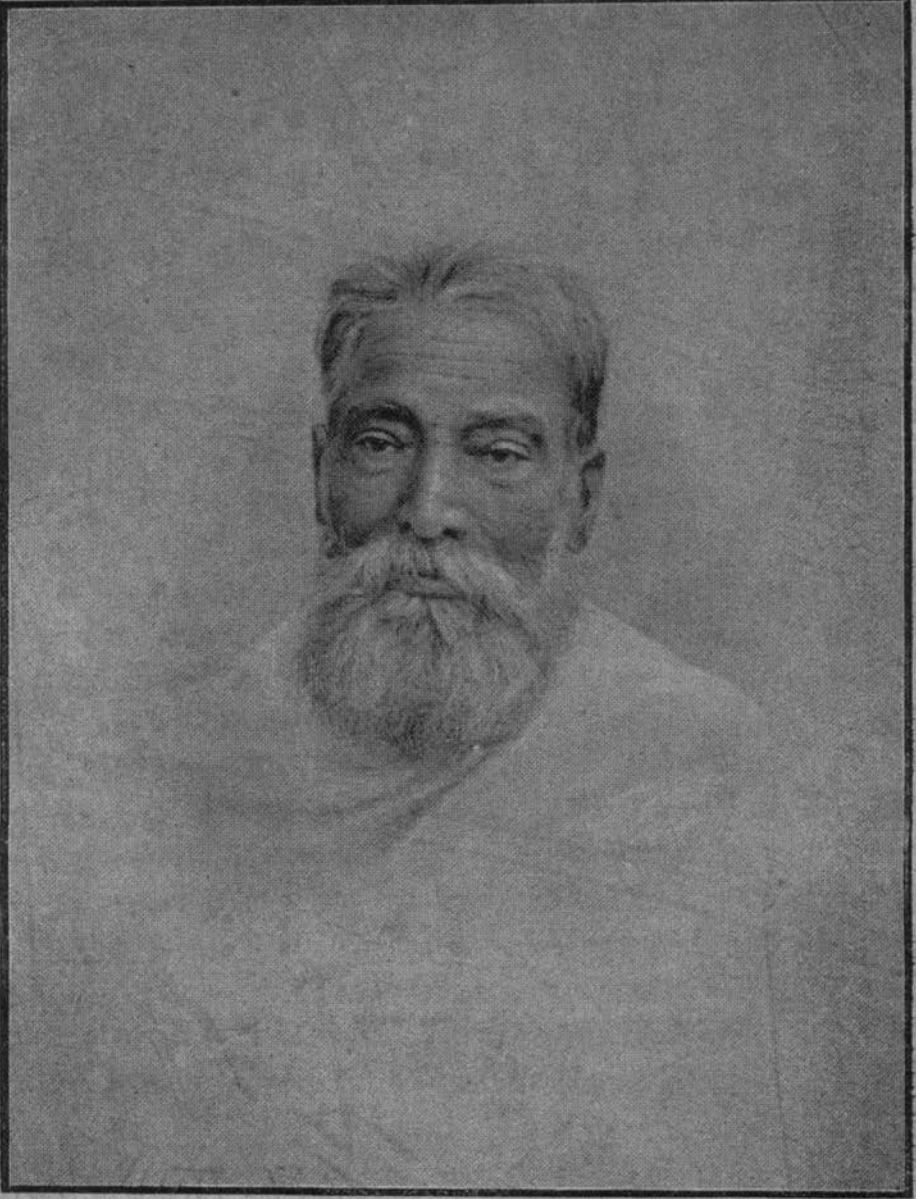
স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

নারায়ণ

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]　　　　[কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল।

বেণের মেয়ে

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

মস্করী দেশে ফিরিলেন। তিনি গঙ্গা বাহিয়া আসিয়া অম্বুয়ার উত্তরে বল্লুকা নদীর ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে বড়োয়ানে নামিয়া হাঁটিয়া চৌথখণ্ডে গেলেন। সেথান হইতে পিশাচখণ্ড বেশী দূর নয়। নিজের বাড়ী গিয়া তিনি চারি পাঁচ দিন বিশ্রাম করিলেন। এত দিন গৃহিণী অগ্নিরক্ষা করিতেছিলেন। সে ভার তিনি বহুদিনের পর নিজেই লইলেন। এবার কিন্তু ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর মনের ভাব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পিশাচখণ্ডের উপর তাঁহার বড় মায়া নাই। তিনি চারিদিক্ হইতে হিসাবপত্র গুটাইতে লাগিলেন; সোনা, রূপা, হীরা, জহরত প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস লইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ইহাতে কিছু ভয় পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলে পিশাচখণ্ডী উত্তর দিতেন,—"আর কি? বিবাহের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন ৬০।৬২ বছরের উপর বয়স হ'ল, ৩০ বৎসরের উপর অগ্নি-রক্ষা করিয়াছি। এখন অগ্নি-বিসর্জ্জন দিয়া চল আমরা তীর্থ-বাস করি গিয়া। ছেলে-পিলে ত হইলই না। বিষয় রক্ষা করিয়াই বা কি হইবে? সংসারধর্ম্ম করিয়াই বা কি হইবে?" ব্রাহ্মণীকে এইরূপ বুঝান; কিন্তু নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোক সংগ্রহ করেন। তিনি তাহাদের তীর-ধনু-ঢাল-তরবাল খেলা শিখান, ঘোড়ায় চড়া শিখান, বল্লম ধরা, কোঁচা ধরা শিখান। এইরূপে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ তিন মাস কাটিয়া গেল। তিনিও

বাহির হইয়া দেবগ্রামে ভবদেবের সঙ্গে ও ময়নামতীর পাহাড়ে হরিবর্ম্ম দেবের সহিত দেখা করিলেন। আসল কথা এই দুজনের কাছেই ভাঙ্গিলেন, আর কাহারও কাছে ভাঙ্গিলেন না। ইঁহারাও কাশ্মীর, নগরকোট, থানেশ্বর প্রভৃতি দেশের দুর্দ্দশা শুনিয়া একটু ভয় পাইলেন এবং যথাসাধ্য মুসলমানদের বাধা দিবারও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২

ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মস্করী সাতগাঁয় আসিলেন, রাজা বিহারীর সহিত দেখা-করিলেন, মায়ার সহিত দেখা করিলেন, পোষ্যপুত্র দুটিকে দেখিলেন। তাহারা সম্পর্কে 'মামা-ভাগ্নে' হইলেও মাণিকযোড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মায়ার ছেলেটি দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহার মধ্যে জলে ঝাঁপাই ঝোড়ে, গাছে উঠে, জন্তু-জানোয়ার তাড়ায়, ছোট ছোট তীর-ধনুক লইয়া খেলা করে। তাহার মামা তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ছেলে যখন তীর-ধনুক লইয়া কাক-বক-শিয়াল-কুকুর তাড়না করে, মায়ের তখন বড় আনন্দ হয়। তখন সে দু'হাত বাড়াইয়া ছেলেটিকে কোলে লইতে যায়। ছেলে কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দূরে সরিয়া যায় এবং আর একদিকে তীর মারে।

মস্করী মহাবিহারে গেলেন, গুরুপুত্রের সহিত দেখা করিলেন—দেখিলেন, সবার চেয়ে গুরুপুত্রেরই স্ফূর্ত্তি বেশী। তিনি ২।৩ কুঠারী সোনার প্রতিমা দেখাইলেন, ৪।৫টি জ্যোতি-লিঙ্গ শিব দেখাইলেন—একটি ছোট পায়রার ডিমের মত হীরার বাণলিঙ্গ, একটি পান্নার গৌরীপট্টের উপর বসান, পাটাটি আবার একটি বৈদূর্য্য-শিলার উপর রাখা, বৈদূর্য্য-শিলার পিছন দিক্ হইতে একটি সোনার ডাঁটা উঠিয়া শিবের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে; ছাতা সোনার তারে গাঁথা, চারিদিকে ঝালোর দেওয়া, ঝালোরে ছোট ছোট হীরা, ছোট ছোট মুক্তা, ছোট ছোট পান্না, ছোট ছোট পল্লা, ছোট ছোট নীলা দেওয়া। মস্করী ত দেখিয়াই আশ্চর্য্য; বলিলেন, "কারীকর কে?" উত্তর—"সোনার গাঁয়ের সেকরারা।" মস্করী খুব নিপুণ হইয়া জিনিসগুলি দেখিলেন, শতমুখে গুরুপুত্রের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তাহার পর দু'জনে নির্জ্জনে বসিয়া বাঙ্গলায়, মগধে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধদের পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মস্করী নালন্দার কথা বলিতে বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া গেলেন। নালন্দার কথা শুনিয়া গুরুপুত্রও মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—যত শীঘ্র পারেন, একবার বৌদ্ধদের এই পরমতীর্থ দেখিয়া আসিবেন। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন—"আমার গুরুদেবও আসিয়া পৌছিবেন। তিনি এখন ললিতপত্তনেই আছেন। আমি আরও কাজ করিয়াছি; লক্ষ্মী-ভগবতীর যতগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাঁচিয়া আছে, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। প্রকটনিতম্বা স্বয়ং আসিবেন।"

মস্করী সেখান হইতে বিহারী দত্তের বাড়ী গেলেন। বিহারী হিন্দুদের অনেক জিনিসপত্র

সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—অনেক পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনওয়ালার পদ সংগ্রহ করিয়াছে, অনেক গায়ন নিমন্ত্রণ করিয়াছে। মঙ্করী দেখিলেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটা মহা সমারোহ হইবে, মহা-আয়োজন হইবে, মহা সাজ-সরঞ্জাম ধুমধাম হইবে, সমস্ত সাতগাঁটা যেন তার জন্ম টলমল করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মঙ্করীর আহ্লাদ ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তিনি কিছুদিনের জন্ম দেশের ও ধর্ম্মের যে মহাবিপদ্‌ উপস্থিত, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কিছু-দিন উহাতেই মাতিয়া রহিলেন।

৩

ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। গোলার সম্মুখে, মহাবিহারের সম্মুখে যেখানে গঙ্গার এপার ওপার দেখা যায় না, তাহার ঠিক মাঝখানে—ঠিক বুকের উপর, এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়াছে। চড়ার চারিদিকে বালি জল হইতে একটু একটু করিয়া উঠিয়া শেষে মাটীতে দাঁড়াইয়াছে। সে মাটী প্রায়ই বর্ষায় ডুবে না, জল হইতে প্রায় ৩।৪ হাত জাগিয়াই থাকে। মাটীর উপর ঘাস, বন-জঙ্গল খুব হইয়াছে, দুই চারিটা গাছও হইয়াছে। জায়গাটা প্রায় এক শত বিঘা হইবে। চাঁদের আলো যখন জঙ্গলের উপর পড়ে, তার পর বালির উপর, তার পর জলের উপর পড়ে, তখন সে আলোর খেলা বড়ই বিচিত্র হয়, বড়ই মধুর হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন জঙ্গল সাফ হইয়া যাইবে, চড়াটি বেশ করিয়া সাজান হইবে, দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে থাকিবে, চারিদিকে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই চড়াতেই চাঁদের আলোর খেলা আরও চমৎকার হইবে। এত বড় একটা রাজসভা হইবে, একবিন্দু তেল পুড়িবে না, একটিও আলো জ্বলিবে না—ভগবানের আলোতেই সব আলো করিয়া রাখিবে। সাতগাঁয়ের লোকে উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে বিহারী দত্তের লোক আসিল, জঙ্গল কাটা সুরু হইল। এতটা জঙ্গল সব জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেগুলা যে কোথা ভাসিয়া গেল, ঠিক নাই। ঘাস ত এমনিই ছিল—প্রায়ই দূর্ব্বা-ঘাস, মাঝে মাঝে মুথা, ঘাসের জন্ম কোন কষ্ট পাইতে হইল না। জমীও সমতল ছিল,কোথাও এককোদাল চাঁচিতেও হইল না। চারিদিকে পতাকা-নিশান উড়িতে লাগিল। রাজার জন্ম একটা জমকাল চাঁদোয়া ছাড়া চড়ার উপরে একটা সামিয়ানাও খাটাইতে হইল না। কেবল বসিবার আসন পাতিতে লাগিল, পাতিতে পাতিতে দেখা গেল, দূরের লোক রাজসভার কিছুই দেখিতে পাইবে না—সুতরাং দূরের লোকের দেখিবার জন্ম একটু উঁচা করিয়া, একটু ঢালু করিয়া দেওয়ার দরকার হইল। তাহাও হইল।

ক্রমে নৌকা আসিয়া বালির চড়ায় লাগিতে লাগিল। নৌকা হইতে দেখাইবার জিনিসপত্র তুলিয়া, যেখানে রাজা বসিবেন, তাহার চারিদিকে সাজান হইতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস সাজান হইতে লাগিল। দুই চারি জন প্রহরী চড়াতেই

থাকিত, আর সকলে নৌকায় থাকিয়াই পাহারা দিত। চড়ায় পাঠাইবার আগে সমজ-দারেরা সমজিয়া লইয়া, গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া সেগুলি একখানি খাতায় টুকিয়া রাখিত। তাই দেখিয়া পরে পুরস্কারের মাত্রা ঠিক হইবে। পরীক্ষাটা কতক মহাবিহারে হইত, কতক বিহারী দত্তের বাড়ীতে হইত। কিন্তু কাব্য ও শাস্ত্রের পরীক্ষা মস্করী নিজেই করিতেন, কখন কখন ভবদেব ঠাকুরের সহিত পরামর্শও করিতেন। পরামর্শ করার বিশেষ দরকারও ছিল। কারণ, এই দুই বিষয়ে যাঁহারা পুরস্কার লইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের মাথা। স্বয়ং উদয়ন আসিয়াছেন, শ্রীধর আসিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র আসিয়াছেন, প্রভাকর-মতি আসিয়াছেন, উদয়নের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীহীর পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহার জোয়ান ছেলে শ্রীহর্ষ আসিয়াছেন—তিনি ইহারই মধ্যে এই বয়সেই অনেক রাজা-রাজড়ার কাছে প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছেন। কনৌজের রাজাই তাঁহাকে দুইটি পান ও আসন দিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকটনিতম্বা আসিয়াছেন-তাঁহারও খ্যাতি বড় কম নয়। কাব্য-শাস্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। বজ্রদত্ত আসিয়াছেন, তাঁহার লোকেশ্বরশতক ইহারই মধ্যে সহস্র কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। রত্নাকর শান্তি আসিয়াছেন—তিনি কাব্যেও যেমন প্রবীণ, শাস্ত্রেও তেমনি প্রবীণ। তাঁহার ভাষায় কাব্য আছে, সংস্কৃত কাব্য আছে, ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। শুভাকর গুপ্ত আসিয়াছেন। ইনিই সবপ্রথম বৌদ্ধদের জন্য একখানি স্মৃতি রচনা করিবার চেষ্টা করেন। জৈন পণ্ডিত অভয়দেব মলধারী আসিয়াছেন। নাথযোগী চামরীনাথ আসিয়াছেন। সিদ্ধ সহজিয়া দারিপা আসিয়াছেন, ভাদে আসিয়া-ছেন, ঢেণ্ঢন আছিয়াছেন, ডুম্বরী আসিয়াছেন, কমলকন্দারি আসিয়াছেন, চিপিল আসিয়াছেন। নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথ, চামযনাথ, তণ্ডিছা, হাড়িপা—ইঁহারাও আসিয়াছেন। এই সকল লোকের কাব্য ও শাস্ত্র পরীক্ষা করা কি মস্করীর কাজ? মস্করী যত বড় বিদ্বানই হউন না কেন, যাঁহাদের নাম করা গেল,তাঁহারা তাঁহাকে গুলিয়া খাইতে পারেন, তাঁহাকে বিশ বছর পড়াইতে পারেন। তবে মস্করী খুব চৌকস লোক, সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আছে, চোখে তাঁহার কিছুই এড়াইয়া যায় না। ভবদেব এ সকলের চেয়েই পণ্ডিত বেশী, বুদ্ধিমান্ বেশী, কাজের লোক বেশী, চৌকসও বেশী। ভবদেব কোন কথা বলিলে, ভারতে এমন কেহই ছিল না যে, তাঁহার কথার উপর কথা নয়। তাই মস্করী সর্ব্বদাই ভবদেবের সহিত পরামর্শ করেন।

২

এইরূপ উদ্যোগপর্ব্বে সকলেই ব্যস্ত। রাতদিন নৌকায় যাতায়াতে সাতগাঁর গঙ্গা তোলপাড়। বড় বড় লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন—আর কেবল ভেরী, শিঙ্গা

বাজিতেছে। ভাট-চারণগণ তাঁহাদের যশোগান করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় একদিন রাত্রিতে মহাবিহারের চরিদিকে আলো জলিয়া উঠিল। ত্রিমালা মন্দির তিনটা আলোরাশির মত বোধ হইতে লাগিল—একটাকে বেড়িয়া একটা, দুইটাকে বেড়িয়া আর একটা। পাঁচতলা তোরণগুলা আলোময় হইয়া উঠিল। নানারূপ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বহু কালের পর মহাবিহারের অধিকারী লুইসিদ্ধা আবার সাতগাঁয়ে আসিয়াছেন। তাই সহজিয়ারা আজ আনন্দে মাতোয়ারা। রূপা রাজার রাজ্য নাশ হইয়াছে শুনিয়া লুইসিদ্ধা বড়ই দুঃখিত, বড়ই ম্রিয়মাণ, বড়ই বিমর্ষ। তিনি আসিয়া মহাবিহারের দেব-দেবীগণকে পূজা করিলেন, নমস্কার করিলেন, সব সহজিয়াগণকে মহাবিহারে ডাকিলেন। ভোটদেশ, মঙ্গলদেশ, নেপাল, সুবর্ণদ্বীপ, হংসদ্বীপ, এই সকল জায়গায় যাহা যাহা করিয়া আসিয়াছেন, চেলাদের সব তিনি শুনাইলেন। গুরুদেব এই সকল দেশে পূজা পাইয়াছেন জানিয়া তাহারাও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার সোনার ও পাথরের প্রতিমা লইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার অষ্টধাতুর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অনেক দেশে তাঁহার নামে মন্দির দিয়াছে—তাঁহার নামে যাত্রা, মহোৎসবও চালাইয়াছে—ঐ সকল শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইল, ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া গেল।

তিনি আসা অবধি সাতগাঁয়ে আবার কীর্ত্তনের ধুম পড়িয়া গেল। খুলীরা অনেক বৎসর ধরিয়া দেশবিদেশে খোল বাজাইয়া হাত এমনি সাফ করিয়াছে যে, খোলে চাটি দিবামাত্র-রাগ রাগিণী যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া নাচিতে থাকে। কীর্ত্তনীয়ারা যখন খোলের সহিত গলা তুলিয়া সহজিয়া পদ গাহিতে থাকে আর সেই সঙ্গে খঞ্জনীখরতাল বাজিতে থাকে, শিঙ্গা বাজিতে থাকে, তখন সমস্ত লোক একতান-মনপ্রাণে সেই গান শুনিয়া প্রেমে, সুখে, মোহে আর মোহনীতে মজিয়া যায়, সহজিয়ার সার কথা তাহাদের মনের মাঝে তখন ভাসিয়া উঠে। তাহারা এই ক্ষণিক সুখকে নিত্য সুখ করিয়া লই-বার জন্য ব্যস্ত হয়, তন্ময় হয়, একাগ্র হয়—মনে করে, যদি এই ভাবে চিরদিন থাকিতে পারি, এই ভাবে এই সুর নিরন্তর কানে বাজে, এইরূপ প্রেম যদি নিত্য হয়, এইরূপ সুখ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহিনীও যদি নিত্য হয়, সেই ত নিত্যানন্দ, সেই ত নির্ব্বাণ, সেই ত শূন্যময়, বিজ্ঞানময়, মহাসুখময় নিত্যবুদ্ধভাব, সেই ভাবের জন্য তাহারা পাগল হইয়া উঠে, উন্মাদ হইয়া উঠে। লুইসিদ্ধার কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তন আরম্ভ করিবামাত্রই এইরূপ সুর জমিত, এইরূপ গান জমিত, এইরূপ ভাব জমিত, এইরূপ একাগ্রতা আসিত। আর যতক্ষণ সে গানের বিরাম-সুর কানে না লয় হইয়া যাইত, ততক্ষণ একভাবেই থাকিত। অনেকের ভাব লাগিত, তাহারা অজ্ঞান হইয়া যাইত, অনেকরূপ সাত্ত্বিকবিকার তাহাদের দেহে প্রকাশ পাইত।

লুইসিদ্ধা গুরুপুত্রের কাছে সাতগাঁয়ের সব ব্যাপার আগাগোড়া শুনিলেন—বুঝিলেন, দলাদলির ঝোঁকে শ্রীফলবজ্র সহজিয়াদের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি ভাবিলেন—"আজ যদি মহারাজাধিরাজ রূপনারায়ণ থাকিতেন, আমরা বাঙ্গলাও মাতাইতে পারিতাম, বাঙ্গলায়ও আমাদের জয়জয়কার হইত। যাহা হোক, যা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই। আমাদিগকেও কিছু দিন স্রোতে গা ভাসান দিতে হইবে। লুইসিদ্ধা সেবার সাতগাঁয় বাহির হইয়াছিলেন হাতীর উপর হাওদায় বসিয়া, এবার বাহির হইলেন হাঁটিয়া; সেবার বাহির হইয়াছিলেন রাজসাজে, এবার বাহির হইলেন ভিক্ষুসাজে; সেবার সঙ্গে ছিল রাজার দল, এবার সঙ্গে ছিল কীর্ত্তনীয়ার দল; সেবার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার লোক, এবার সঙ্গে কেবল কয়েকটি কীর্ত্তনীয়া। তিনি, যে ডাকিল, তাহারই বাড়ী গেলেন, কিন্তু সকলের আগে গেলেন রাজা বিহারী দত্তের বাড়ী। বিহারী দত্ত তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। মায়াও তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, পূজা করিল, ফুল দিল, মালা দিল, চন্দন দিল। তিনি ভবদেবের সহিত দেখা করিলেন, ভবদেবও তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিলেন এবং রাজা আসিলে তাঁহাও সম্মুখে কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—বলিলেন,—"মহারাজাধিরাজ আমাদেরই বড়ই গুণগ্রাহী, তিনি কেবল গুণই দেখেন, জাতি দেখেন না, ধর্ম্ম দেখেন না, কুল দেখেন না, সম্প্রদায় বাছেন না।" লুইসিদ্ধা ঘাড় হেঁট করিয়া ভবদেবঠাকুরের কথাগুলি শুনিল, আর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৫

চতুর্দ্দশীর দিন সকালে গোলীন গ্রামের সামনে গঙ্গার যে সব প্রকাণ্ড খাড়ী আছে, তাহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে যেখান হইতে যমুনা বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিক্ হইতে রণবাদ্য শুনা যাইতে লাগিল। ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, ঝাঁঝের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। জলরাশির উপর দিয়া সে বাজনা সুদূর গোলীন বা সাতগাঁয়ে যখন পৌছিল, তখন তাহার আর রণ-রণ ভাব নাই; দুরন্ত বাজনার শব্দ যেমন মধুর হয়, তেমনি মধুর শুনা যাইতে লাগিল। প্রথমতঃ কিসের শব্দ বলিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর কান পাতিয়া শুনিল, শব্দ ঈশানকোণ হইতে আসিতেছে আর শব্দটা যুদ্ধের বাজনার শব্দ—কুচকাওয়াজের বাজনার শব্দ। তখন তাহারা ভাবিল, রাজা আসিতেছেন। যমুনা বাহিয়া আসাই তাঁহার পক্ষে সুবিধা—তিনিই আসিতেছেন। তখন নগরশুদ্ধ লোক গঙ্গার ধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গঙ্গার ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের বাড়ীতে আর লোক ধরে না। যাহাদের দুতালা ছিল, তাহাদের ছাদে পর্য্যন্ত লোক উঠিল। সকলেরই মুখ একদিকে—ঐ ঈশানকোণে ঐ দিক্ হইতে বাজনা আসিতেছে।

ঐ দেখা যায়,—ঐ দেখা যায়—ঐ যে রাজার ডিঙ্গী—ওখানা ময়ূরপঙ্খী—দেখ্‌চ না, ঐ ময়ূরের মুখ দেখা যায়—হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খীই বটে—দেখ না, ময়ূরের মাথার তিনটা চূড়া পর্য্যন্ত রহিয়াছে—হাঁ হাঁ, ময়ূরপঙ্খী নিশ্চয়ই—ঐখানাতেই রাজা আছেন—দেখ্‌চ না নিশান—ঐখানাতেই রাজা—দেখ ত কয়খানা ডিঙ্গা আছে—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত—এক সাঙ্গা, আট—নয়—দশ—এগার—বার—তের—তেরখানা—দূর চৌদ্দখানা—কিসে হ'ল ? আর, ময়ূরপঙ্খীখানাকে ধর্‌লি না—তবে আবার গুণি—এক—দুই—ইত্যাদি চোদ্দখানাই বটে। দুসাঙ্গা ডিঙ্গায় রাজা আসিতেছেন।

ফাল্গুন মাস—একটানা গঙ্গা—তাহাতে বাঙ্গাল মাঝী—খুব পাকা—হালেই বল, দাঁড়েই বল—খুব শক্ত—তাহাতে আবার আজ একটু উত্তরে বাতাস বহিয়াছে—উত্তরে বাতাসের এই শেষ—বাতাসও মরণ-কামড় কামড়াইতেছে। সাঙ্গা হু হু করিয়া গোলীনের দিকে আসিতে লাগিল—ময়ূরপঙ্খীর মাথাটাই দেখা যাইতেছিল—এখন সবটাই দেখা যাইতে লাগিল—উত্তরে বাতাস পাইয়া পাল তুলিয়া দিয়াছে—পাল অনেকগুলা; সেগুলা এমন চিত্র-বিচিত্র করা, যেন ময়ূরের পেখম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ময়ূরের পেখমের মত উজ্জ্বল লাল, উজ্জ্বল নীল, উজ্জ্বল জরদায় ঠিক বোধ হইতে লাগিল, বসন্তকালেও ময়ূর পেখম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। ময়ূরের পেখম ও ঘাড় এ দুয়ের মধ্যে কামরা—কতগুলা গণা যায় না। ময়ূরের রঙে রঙ করা—মাঝখানে তিনটা দোতালা কামরা ও তাহার মাঝখানে একটা তেতালা কামরা। এগুলার রঙ আর একরূপ, এমন করিয়া সাজান যে, বোধ হয়, একটা মানুষ বসিয়া আছে—তাহার গায় রাজবেশ। যেন ময়ূরে চড়িয়া কার্ত্তিক আসিতেছেন।

সাঙ্গা যতই কাছে আসিতে লাগিল, লোকের কোলাহল ততই বাড়িতে লাগিল। কে আগে কি দেখিয়াছে, তাহাই লইয়া অনেকে কোলাহল বাড়াইয়া দিতে লাগিল। রাজার জয়, হরিবর্ম্মার জয়, মহারাজাধিরাজের জয় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, প্রথম অল্প, তাহার পর একটু উচ্চ,—যতই কাছে আসিতে লাগিল, তত উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। যখন গোলীনের সামনে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন উচ্চতম হইয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার লোক 'রাজার জয়, রাজার জয়' বলিতে লাগিল। শেষ সব শব্দ ডুবিয়া গিয়া এক জয় শব্দ জয়জয়কার করিতে লাগিল।

হরিবর্ম্মার ময়ূরপঙ্খীখানি ধীরে ধীরে পাড়ের অতি কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। তেতালায় রাজা ছিলেন। তিনি বাহিরে দোতালার ছইয়ে আসিয়া কিনারায় দাঁড়াইলেন। যতবার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—ঘাড় নোঙাইয়া হাত তুলিয়া জয়ধ্বনির উত্তর দিতে লাগিলেন। নমস্কারের প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। কতকগুলা দুষ্ট লোক বলিতে লাগিল—মহারাজকেই এ রাজসভায় প্রথম ও প্রধান পুরস্কার দেওয়া উচিত। এমন করিয়া ময়ূরপঙ্খী আর কেহ কি সাজাইতে পারিত ?

হরিবর্ম্মার ময়ূরপঙ্খী স্বপ্নের মত শীঘ্র শীঘ্র সাতগাঁর লোকের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আর চড়া ঘুরিয়া চড়ার পূর্ব্বদিকে গিয়া নঙ্গর করিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, 'এ কি দেখিলাম—অদ্ভুত অদ্ভুত!' লোকে আর ময়ূরপঙ্খী থেকে চোখ ফিরাইতে চায় না—দেখিয়া তাহাদের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কিন্তু তৃপ্তি না হইলেই বা কি হইবে, ক্রমে যে চোখের বাহির হইয়া গেল, ক্রমে যে চড়ায় আড়াল পড়িল—নিঃশ্বাস ফেলিয়া লোক চোখ ফিরাইল, যাহারা রাজদর্শনের পুণ্য চায়, তাহারা ছোট ছোট ডিঙ্গা খুলিয়া ময়ূর-পঙ্খীর পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল,—প্রায় হাজার ছোট নৌকা খুলিয়া গেল। অনেক লোক তাহাতে উঠিয়া গেল। বাকী লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক এক করিয়া ফিরিয়া ঘরে গেল।

৬

রাজাধিরাজের নৌকা নঙ্গর করিলেই রাজা বিহারী তাঁহাকে গিয়া নমস্কার করিলেন। রাজা বলিলেন, 'বিহারী, কাল দোল। আমরা যাদব, আমরা দোলটি আমাদেরই উৎ-সব বলিয়া মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন, তাঁহারই উৎসব। কাল দোলও হইবে, আবার রাজসভাও হইবে। সুতরাং আজি চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেও যে, কাল সকালেই যেন সকলে দোলের উৎসব সারিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে মহাসভায় হাজির হয়। বৈকালে যেখানে যেখানে দোলের মেলা হয়, সেগুলি বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বন্ধ করিতে গেলেই একটা গোল উঠিতে পারে। বিশেষ বৌদ্ধদের দোল অন্যরূপ, তাই আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বলিয়া দেও যে, যাহারা মেলা—বিশেষ দোলের মেলা—দেখিতে চাহিবে, তাহা-দের জন্য রাজসভার দুই পাশে মেলা বসিবে। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই দোল খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে ও হাট-বাজার বসিবে।'

বলিতে না বলিতে রাজার রণবাদ্যওয়ালারা দুজন তিনজন করিয়া বাহক হইয়া গেল ও যে যেখানে পাইল,ঢেঁটরা দিয়া রাজার আজ্ঞা প্রজাদের জানাইয়া দিল। বিহারীর ঢেঁটরা-ওয়ালারাও চারিদিকে জানাইয়া দিল। সে কালে লোককে রাজার বা বড়লোকের আজ্ঞা জানাইয়া দিবার জন্য চৌমাথায় ও অন্যান্য খোলা জায়গায় একটা করিয়া থাম থাকিত। থামগুলা চৌকোণা, ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গা খুব মাজা পালিস করা। রাজার লোক তাহার উপর খড়ি দিয়া বা কালী দিয়া রাজার আজ্ঞা জানাইয়া দিত। এবারে সব থামেই লিখিয়া দোওয়া হইল। বড় বড় অক্ষরে রাজার আজ্ঞা—'তোমরা সকালে সকলে দোল সারিয়া ফাগ খেলিয়া বৈকালে উজ্জ্বল বেশে রাজসভায় যাইবে। সেখানে মেলা হইবে। নানারূপ দোলের ব্যবস্থা আছে—হাটবাজার আছে, রাজার আজ্ঞা, সবাই যাবে। কেহই বাড়ী বসিয়া থাকিবে না। ছেলে মেয়ে সবাই যাবে। কার আজ্ঞা—রাজার আজ্ঞা।'

যতবারই ঢেঁটরা হয়, এইরূপই হয়। থামে লিখিয়া দেওয়া হয়, আর চুলি দিয়া দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া হয়। এবার এক নূতন ব্যাপার হইয়াছে। রাজা বিহারী কোন্ দেশ থেকে "কায়গদ" নামে বড় বড় পাতলা তক্তার মত কি আনিয়াছে। তক্তার সঙ্গে তার তফাৎ এই যে, সেগুলা গুটান যায়, তক্তা গুটান যায় না। তার উপর বেশ লেখা চলে; এই কায়গদে ছোট করিয়া লিখিয়া থামে মারিয়া দেওয়া হইল। আবার বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়ালেও মারিয়া দেওয়া হইল।

রাজা বিহারী তখনই মহাসভার দুই পার্শ্বে দোল খাবার ব্যবস্থা করিলেন ও মেলা বসাইতে বলিলেন। সাতগাঁ বেণের দেশ, বিহারীর মুখের কথা খসিবামাত্র সব ঠিক হইয়া গেল। উত্তরদিকে হিন্দুদের ও দক্ষিণদিকে বৌদ্ধদের জন্য দোল, নাগরদোল, ঘোড়াদোল খাটাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরাও দোল খাইবে, ছেলেরাও দোল খাইবে। হিন্দুর দেবতারা প্রথম দোল খান, তার পর মানুষে প্রসাদ পায়; বৌদ্ধদের দোল খেরারা আগে খান, তার পর অন্য লোকে প্রসাদ পায়। এখনকার বৌদ্ধরা আবার শক্তি লইয়া দোল খান। প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যেই খাইতেন, এখন প্রকাশ্য-ভাবে খান। এবার কিন্তু হিন্দু-রাজা পাছে চটেন, তাই সকলে প্রকাশ্যে শক্তি আনিবে না স্থির করিয়াছে। দু এক দল কিন্তু শক্তি লইয়াই আসিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

৭

দোলটা ঋতুর উৎসব। সুতরাং উহা যে শুধু হিন্দুরই উৎসব, অন্য কাহার নহে, এ কথা ঠিক নহে। উহা ভারতবাসিমাত্রেরই উৎসব। এমন কি, মানবজাতিরই উৎসব। শীত যায়, বসন্ত আসে, ঠিক সন্ধিস্থলে এই উৎসব। শীত হইল মেড়া অসুর, তাহাকে আগের দিন মারিয়া পোড়াইয়া পরের দিন উৎসব। উৎসব মানে স্ফূর্ত্তি। আর শীতের ভয় নাই, গায়ে কাপড় দিতে হইবে না, উত্তরের বাতাসে গা যেন কাটিয়া দেয়, সে বাতাস আর বহিবে না। দক্ষিণে বহিবে, তাহাতে দেহ ও মনের আনন্দ হইবে। শীতকালের চাঁদের আলোর উপর যেন একটা খুব পাতলা হিমের আবরণ থাকে, আলো ফিকা দেখা যায়। সেটা আর থাকিবে না, চাঁদের আলো ঘন হইবে—উজ্জ্বল হইবে। শীতকালে এক কুঁদ ছাড়া ফুল হয় না। এখন সব গাছের পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, আর তাহার গা হইতে যেন ফাটিয়া ফুল বাহির হইতেছে। পলাশফুল ফুটিয়া চারিদিক্ লাল করিয়া দিয়াছে; পৃথিবী যেন নূতন বৌয়ের মত রাঙা চেলি পরিয়া আছেন। শিমুল লালফুলে লাল হইয়া বসিয়া আছে। সোঁদাল সোনার রঙ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আমের বউল ফুটিয়া

গন্ধে আমোদ করিতেছে। সকলের উপর জলপদ্ম টিয়া রূপে, গুণে ও গন্ধে যেন মূর্ত্তিমান্ বসন্তলক্ষ্মী হইয়া আছে।

রাজার ঢেঁটরা বন্ধ হইলে, কিছুক্ষণ পরে ছেলেদের ভিতর খুব গোল উপস্থিত হইল। রাম শ্যামকে ডাকিল চ-চ-চ; হরি কৃষ্ণকে ডাকিল—আয় আমরা যাই। বিনোদ কানাইকে, সাধুকে ডাকিল—আয় আমরা সরস্বতীর ও পারে যাই। সবাই সকলকে ডাকিতেছে, কেহই কাহার জবাব অপেক্ষা করিতেছে না। সবাই সরস্বতীর পশ্চিম পারে যাইতেছে। নৌকা লাগানই আছে, কোথাও কোথাও নৌকার সাঁকো আছে। লোকে হু হু করিয়া পার হইতেছে। ছেলেরাই পার হইতেছে—১২ থেকে ২৪ পর্য্যন্ত বয়সের লোকেই পার হইতেছে, আধাবয়সী যারা, তারা যাইতেছে না। যাহারা পার হইতেছে, তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? পার হইয়া তাহারা মাঠে পড়িল,সেখানে সারি সারি মেড়া অসুর সাজান আছে; বাঁশের উপর খড়জড়ান একটা বিকট মূর্ত্তি। সব হিন্দুর বাড়ীই দোল। সব বাড়ীতেই মেড়া অসুর আছে,সব মেড়াই মাঠে আসিয়াছে সারি সারি হাজার হাজার মেড়া সাজান। সন্ধ্যাটি হইল, আর ছেলেরা উন্মত্ত হইয়া মেড়ায় আগুন লাগাইতে লাগিল। কতকগুলা ছোট ছোট ঝোপড়ার মত ঘর ছিল, তাহাতেও আগুন লাগাইয়া দিল আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা নাচিতে লাগিল, গাইতে লাগিল ও হাততালি দিতে লাগিল আর কত রকম বাঁদরামী করিতে লাগিল, তাহা আর লিখিয়া কাজ নাই। চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিল, আগুন তখনও নিবে নাই। তাহারা চারিদিকে একবার চাহিল, একটা হল্লা করিয়া উঠিল, তাহার পর যে যাহার ঘরে গেল।

৮

পরদিন সকালে দোল। দোলে সবাই মাতে, হিন্দুরা ঠাকুরকে দোল দেয়। আপনারা বড় একটা খায় না। বৌদ্ধেরা থেরাদের দোল দেয়, তার পর আপনারা খায়। ফাগ সবাই খেলে। শঠীর পালোয় পালায় জল দিয়া ফাগ তৈয়ার হয়, তাহাতে বিষাক্ত কিছুই থাকে না। দেদার ছোড়ে, যার তার গায় দেয়, কেউ কিছু বলিতে পারে না। এটা ফাগের দিন। বুড়ো ঠাকুরদা নাতিকে ফাগে বুড়াইয়া দিতেছেন। ছোট ছোট নাতিরা ঠাকুরদাদার মাথায় ফাগ মাখাইয়া দিতেছে। মেয়েরা ছেলেদের গায় ফাগ দিতেছে। আর ছেলেরাই ছাড়িবে কেন? তাহারাও মেয়েদের গায়ে ফাগ দিতেছে। রাস্তা ফাগে ফাগে ৫ ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠিল। তাহার উপর পিচকারী। দূর দূরান্তর হইতে রঙের জলের পিচকারী ছুটিতেছে। লোককে রাঙ্গা জলে নাওয়াইয়া দিতেছে। সব যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। কাল শুধু ছেলেরা খেপিয়াছিল, আজ ছেলে, মেয়ে, যুবা, বুড়ো কেউ বাকী নাই। ঠাকুরপূজো নামে। মাতামাতিই উৎসব। এ দিনকার বাঁদরামীর কথা বলিয়া কাজ নাই। সেটা ড্যাসের মধ্যে থাকিয়া যাউক।

কিন্তু রাজার হুকুম—দুপরের মধ্যেই মাতামাতি থামিয়া গেল। সকলে গা ধুইয়া ফেলিল। সব ফাগ জলে ধুইয়া গেল। গায়ে ফাগের একটা খুব পাতলা ছোপও রহিল না। কাপড়গুলাতে রাঙ্গারঙ্গের গন্ধও রহিল না। এ ত ম্যাজেণ্টারের তৈয়ারি ফাগ নয় যে, সাত দিন ছোপ থাকিবে। দুপরের পূর্ব্বেই সাতগাঁ আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কে যার বাড়ী গিয়া আহারাদি করিল ও সকাল সকাল পার হইয়া চড়ায় যাইবার জন্য সাজিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ঠাকুর হরিদাস

নবম পরিচ্ছেদ

সনাতন-সঙ্গ

কিছুকাল গত হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর বাটীতে যাইয়া উঠিলেন না। শ্রীরূপের স্থায় তিনিও ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি গৌড়ের বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল সাকর মল্লিক। প্রাণে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি সমস্ত বিষয়-আশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের পদে আত্মসমর্পণ করেন। ইনিও এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস' ইঁহারই লেখনীপ্রসূত। তদ্ভিন্ন 'বৃহৎভাগবতামৃত', 'দশম টিপ্পনী' ও 'দশম চরিত' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়া ইনি বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছেন। ইনিও শ্রীরূপের স্থায় একান্ত দৈন্য ও বিনয় বশতঃই মহাপ্রভুর বাটীতে না গিয়া হরিদাসের কুটীরেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' বলেন—

"মূর্ত্তিমান্ মহাতেজ, সমুদ্র-গম্ভীর,
সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর।"

বস্তুতঃ কি রূপ গোস্বামী, কি সনাতন গোস্বামী, কি হরিদাস ঠাকুর, ইঁহাদের সংযম, বৈরাগ্য, ভক্তি ও শক্তির কথা ভাবিলে মনে হয় যে, "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" এই কথা অতীব সত্য, যথার্থ কথা। অপর দিকে ইঁহাদিগের নিষ্কিঞ্চনতা ও তৃণাদপি সুনীচের ভাব দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মহাপুরুষ মর্য্যাদালঙ্ঘন-ভয়ে কদাচ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেন না।

"হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন,
জগন্নাথ-মন্দিরে না যান তিন জন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার কালে অরণ্য-প্রদেশের জলের দোষে সনাতন গোস্বামীর গাত্রে কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অমনি আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন, কিন্তু পাছে কণ্ডূ-রস মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে, এই ভয়ে সনাতন দূরে সরিয়া গেলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে সনাতনের প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল। সেই দুঃখে তিনি জগন্নাথের রথচক্রতলে পড়িয়া কণ্ডূরসান্বিত ঘৃণিত দেহ বিসর্জ্জন দিতে মনে মনে সংকল্প করিলেন! মহাপ্রভু তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক দিন ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া অকস্মাৎ সনাতনকে বলিলেন—

"সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে,
কোটী দেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে,
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

প্রভু কেমন করিয়া মনের কথা জানিতে পারিলেন, ইহা ভাবিয়া সনাতন একান্ত বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—"সনাতন! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। সুতরাং তোমার এই দেহ এক্ষণে আমার। অতএব ইহা বিনাশ করিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি পরের দ্রব্য খোয়াইতে চাও, তোমার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই? এমন কার্য্য করিও না। এ শরীরে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ শরীর দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব।"

"প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন,
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন,
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সনাতন গোস্বামী লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—"দেখ হরিদাস! আমরা এই নীতি-কথা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, পরের গচ্ছিত দ্রব্য কোনও প্রকারে খোয়াইতে নাই। কিন্তু ইনি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহিতেছেন! ইঁহাকে তুমি ভাল করিয়া সাবধান করিয়া দিও, যেন ইনি এমন অন্যায় কার্য্য না করেন।"

"হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস,
পরের দ্রব্য ইঁহ চাহে করিতে বিনাশ।
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়,
নিষেধিও ইঁহায় যেন না করে অন্যায়।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে হরিদাস ঠাকুর সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—"গোসাঞি! তোমার মতন ভাগ্যবান্ কে? তোমার দেহকে মহাপ্রভু তাঁহার নিজের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, এ দেহ দ্বারা তিনি কত কার্য্য করাইয়া লইবেন। আর তুমি ইহাকে বিনাশ করিতে চাও? গোস্বামি! তুমি ধন্য! কেন না, তোমার দেহ প্রভুর কাজে লাগিবে। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমি তাঁহার নিজের কোনও কাজে আসিলাম না। এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এ জীবন ব্যর্থ গেল।'

"তোমার দেহ কহে প্রভু 'মোর নিজ ধন,'
তোমা সম ভাগ্যবান্ নহে কোন জন।
আমার এই দেহ প্রভুর নিজ কার্য্যে না লাগিল,
ভারতভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ গেল।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন কহিলেন—

"হরিদাস! তুমি কি বলিতেছ? তোমার দেহ প্রভুর কার্য্যে লাগিল না? প্রভুর গণের মধ্যে তোমার মতন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ত আমি দ্বিতীয় দেখিতেছি না। কলির জীবে হরিনাম বিতরণের নিমিত্তই প্রভুর ধরাধামে আগমন। তাঁহার সেই নিজ কার্য্য প্রভু তোমার দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন। তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম লও এবং সকলকে শুনাও। কেহ বা আচার করে, কিন্তু প্রচার করে না, অপর কেহ বা প্রচার করে, কিন্তু আচার করে না। তুমি উভয় কার্য্যই কর। অতএব তোমার সমান কে? তুমি সকলের গুরু, তুমি জগতের আর্য্য!"

"আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার,
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য,
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।"

(শ্রীচৈঃ চঃ).

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

অর্থ।—ত্বদীয় বাক্যামৃত প্রতপ্ত জনের জীবনস্বরূপ. ব্রহ্মবিদ্‌গণের সংস্তুত ও পাপহর। উহা শ্রবণমাত্র কল্যাণ ও শান্তি লাভ হয়। ধরাতলে যাঁহারা বিস্তারিতরূপে তাহা পান করান, তাঁহারাই ভূরিদাতা ও ধন্য।

ঠাকুর হরিদাসের কথা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই অজ্ঞাত। নীলাচলে আসিয়া তিনি পনর ষোল বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি আপন আশ্রমে থাকিয়া অহর্নিশি সাধন-ভজনেই রত থাকিতেন। তবে মহাপ্রভুর অনুরোধে কখন কোথাও যাইতেন, এইমাত্র। আমরা পূর্ব্বেই এক স্থলে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রবেশ করিয়া তিনি আপনাকে সেই লীলা-তরঙ্গে একবারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেও তাঁহার জীবনে ঘটনাবাহুল্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি যে দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, এই একটি ঘটনাই লক্ষ ঘটনার তুল্য,' ইহাতে সন্দেহ নাই। আচার দ্বারা যে প্রচার, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। হরিদাস ঠাকুর ৭৫ বৎসর কাল ধরাধামে ছিলেন। তাঁহার এত সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম তাঁহার রসনায় উচ্চারিত হইয়া গগনে-পবনে যে কি শক্তি, কি মঙ্গল-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কত কোটী অর্ব্বুদ ভূচর খেচর প্রাণী সেই শ্রবণ-মঙ্গল হরিনামের শক্তিতে মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই বেণাপোলের জঙ্গলে হরিদাস ঠাকুরের দেবকণ্ঠ হইতে যে জগন্মঙ্গল হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হইয়া মহোদধির কূলে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে বিলীন হইয়াছিল, সেই ধ্বনি, সেই সঙ্গীত, সেই সুর, সেই স্বর, অদ্যাবধি মরুৎ-ব্যোমে ধ্বনিত রহিয়াছে। যাঁহার শুনিবার কান আছে, তিনি শুনেন—ঠাকুর হরিদাস গাইতেছেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরেবতীমোহন সেন।

৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

কবি বলিয়াছেন—

"যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
তাহাদের কেহ কভু করেনি সম্মান।"

পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মরেন নাই, প্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে সম্মান করিব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিকে সম্মান করিতে দাঁড়াইয়া, আমরা একটা গর্ব্ব অনুভব করিব। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথম ভাগে বাঙ্গলাদেশে আমাদের মধ্যে এমন এক জন নির্ভীক স্বাধীনচেতা মনুষ্যকে নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর (Constitu'ionalism) পৃষ্ঠপোষকরূপে আমরা পাইয়াছিলাম। এ কথা হঠাৎ ভুলিয়া যাইবার মত কথা নয়। আর গত শতাব্দীর-সংস্কার-যুগের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় হইতে এ কথাটা মুছিয়া ফেলিয়া দিবার মত কথাও নয়। পণ্ডিত শিবনাথের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, পরহিতে আত্মত্যাগ ছিল, ধর্ম্মানুরাগ ছিল, স্বদেশের হিতকামনা ছিল; ইহা ছাড়া তাঁহার কবিত্ব ছিল, বাগ্মিতা ছিল;—তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে শুধু রস নয়, রসিকতাও ছিল; ধর্ম্ম-জীবনে সত্যকে জানিবার জন্য তাঁহার একটা অনুসন্ধিৎসা ছিল; যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কর্ম্মজীবনে, প্রচলিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির প্রতিকূল হইলেও, সেই যুক্তিমূলক সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য, তাঁহার চেষ্টা ছিল, সাহসও ছিল। এ দিকে তাঁহার চরিত্রের এই বল, তাঁহার সমসাময়িক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার যথেষ্ট অবসরও পাইয়াছিল। ধর্ম্মে, স্বদেশপ্রেমে, সাহিত্য-সেবায় ও সমাজসংস্কারের বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিবনাথ-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে তাহার মূল্য বড় কম হইবে না। তথাপি কেবল বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অপপ্রয়োগে শিবনাথ-চরিত্রের মূল ও স্থূল ভাবটিকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী।

পণ্ডিত শিবনাথ বাঙ্গলা দেশের একটা বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবনকালে, কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত এক দল বাঙ্গালীর মধ্যে একটা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছিল; যৌবনকাল হইতেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন—আমৃত্যু এই সংস্কার-স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর উনবিশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের ইতিহাসের সহিত পণ্ডিত শিবনাথের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত। শিবনাথের জীবনচরিত আলোচনা করিতে হইলে, সংস্কার-যুগের আদি না হউক, মধ্য ও অন্ত ভাগ আলোচনা করিতেই হইবে। একটা যুগের ইতিহাসের সহিত এমনি অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হওয়াতেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখে। বাঙ্গলা দেশে পণ্ডিত শিবনাথের সমসাময়িক এমন অনেকে ছিলেন, অনেকে এখনও আছেন, যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, এমন কি, ধর্ম্ম ও চরিত্রবলেও শিবনাথ অপেক্ষা কম নহেন। অথচ তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথের মত ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার এক কারণ যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কেবল মরিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ দেন নাই। আর দ্বিতীয় কারণ, শিবনাথের জীবন যেমন যৌবনকালের উন্মেষ হইতেই একটা ইতিহাসে স্মরণযোগ্য সংস্কার-স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশ্য, এই সংস্কার-স্রোতের বিরুদ্ধ স্রোতাবর্ত্তে যাঁহাদের জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের জীবনও ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখে। ইতিহাসের যাহা উপাদান, জীবনে এমন কিছু থাকা চাই। যে ব্যক্তি কেবল নিজের মধ্যে নিজে অবস্থান করিয়া চলিয়া যায়, যদিও তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়,—সেই নিজের মধ্যে নিজে নির্ব্বাসিত ব্যক্তি কদাচিৎ ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে এইরূপ অনেক বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মনুষ্যেরা,—কেবলমাত্র,—

> ————"A poor player
> That struts and frets his hour upon the Stage,
> And then is heard no more."

ভিতরের পুরুষকার ও বাহিরের দৈবশক্তি সম্মিলিত হইয়াই ক্ষমতাশালী মনুষ্যদের জীবনকে কাহারও বেশী, কাহারও কম ইতিহাসে অমর করিয়া রাখে।

ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগের আদ্যোপান্ত একটা ইতিহাস আছে। পণ্ডিত শিবনাথই তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহারা ইতিহাস গড়ে, তাহারা প্রায়ই ইতিহাস লিখিবার সময় পায় না। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগের ইতিহাস শুধু লেখেন নাই, এই যুগের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস তিনি বিশেষ রকমেই গড়িয়া গিয়াছেন। অথচ এই শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস তিনি যতটা গড়িয়াছেন, ততটা হয় ত লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগের এই শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই অধ্যায়ে ৺পণ্ডিত শিবনাথের কর্ম্মজীবনকে বিশদরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আশা করা যায়, বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের যুবকগণ পণ্ডিত শিবনাথের স্মৃতির প্রতি এই গুরুতর কর্ত্তব্যটি সম্পাদন করিতে অবহেলা করিবেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পর সংস্কার-যুগের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে পণ্ডিত শিবনাথের কর্ম্মজীবনকে যথাযথ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই, পণ্ডিত শিবনাথের স্মৃতিকে প্রকৃতরূপে সম্মান করা হইবে এবং একটা স্থায়ী মর্য্যাদাও দেওয়া হইবে। অন্যপক্ষে পণ্ডিত

শিবনাথের স্মৃতিকে অমর্য্যাদা করিলে আমাদিগকে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ক্রমে অধিকতর আত্মস্থ হইয়া আমাদিগের এই কলঙ্কের জন্য লজ্জিত হইবে। তাহারা আমাদিগের এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না।

১৮২৮ খৃঃ হইতে ১৮৭৮ খৃঃ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ধারাটি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ইহার এমন একটি স্থানে আমরা আসিয়া উপনীত হই—যেখানে অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত ব্রাহ্ম-নেতাদিগের অপেক্ষা পৃথক্ ও স্বতন্ত্র পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রের একটা মূল ও স্থূল ভাব আমাদের চক্ষের সম্মুখে অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়; এবং পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রের এই মূল ভাবটির জন্য কেবল যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেরই একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, কেশবচন্দ্রের পরে সংস্কার-যুগের ইতিহাসও এই মূল ভাবটিকে অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইখানেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবনের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তিনি যে তাঁহার জীবনের মূলভাব দ্বারা তাঁহার অনুবর্ত্তীদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে, কুচবিহার বিবাহের পর, বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে আর একটি নূতন খণ্ড-ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই খণ্ড-ধারা যে পণ্ডিত শিবনাথের অন্যান্য সুযোগ্য সহযোগী অপেক্ষা কেবল একমাত্র তাঁহারই জীবনের মূলভাব দ্বারা অধিকতররূপে অনুরঞ্জিত হইয়া পরিচালিত হইয়াছে, এই জন্যই কেশবচন্দ্রের পরে ব্রাহ্ম-সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারায় পণ্ডিত শিবনাথের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য; এবং এইখানেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন খব একটা বড় সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

যে ভাবে ব্রহ্ম-সভার সহিত রাজা রামমোহনের, আদি-সমাজের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ও নব-বিধানের সহিত কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যমূলক সম্পর্ক ছিল, ঠিক সেই ভাবে হয় ত সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত পণ্ডিত শিবনাথের সম্পর্ক হইয়া উঠিতে পারে নাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র হইতে পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রে কোথায় কোন্ বস্তু কম ছিল, তুলনা-মূলক বিচারে তাহা অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও এবং এরূপ তুলনা জীবনচরিত-বিশ্লেষণ ও ইতিহাস বিচারের দিক্ দিয়া একান্ত আবশ্যক জানিয়াও, এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, পণ্ডিত শিবনাথের ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্য কম বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁহার একাধিপত্য একান্তভাবে ফুটিতে পারে নাই; এই যে সিদ্ধান্ত, ইহা অনেকাংশেই একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। পণ্ডিত শিবনাথের পূর্ব্বগামী নেতৃত্রয়ের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে অনুবর্ত্তীদের উপর প্রভুত্ব করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে দশের উপর প্রভুত্ব করিবার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আবার পরিপুষ্ট ও বিকসিত হইবার প্রচুর সুযোগও পাইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদা, তাঁহার ধনবল ও চরিত্রের সংযম এ সমস্ত মিলিয়া

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পর ব্রাহ্ম-সমাজে প্রথমে অক্ষয়কুমার, পরে কেশবচন্দ্র ও কৈশব-দিগের প্রতিকূলে একটা প্রভুত্বাভিমান পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছে, ইতিহাস হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিবার নহে। পৃথিবী-বিখ্যাত অসাধারণ বাগ্মী কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রভুত্বাভিমানের প্রতিবাদ করা সত্বেও নিজে এই প্রভুত্বাভিমানের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে না। কাজেই যে প্রতিবাদ তিনি ১৮৬৬ খৃঃ এক দিন দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র দ্বাদশ বৎসর পরে আবার এক দিন সেই প্রতিবাদই সমুদ্র-গর্জ্জনের মত উত্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের প্রভুত্বাভিমানের বিরুদ্ধে এই প্রতি-বাদ পণ্ডিত শিবনাথ এবং তাঁহার সমধর্ম্মী আরও অনেক বিখ্যাত সহযোগী একসঙ্গে মিলিত হইয়া করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন উঠিবে, যদি কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রভুত্বাভিমানের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, আর শিবনাথ কেশবচন্দ্রের প্রভুত্বাভিমানের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন,তবে এই এক জনের যথেচ্ছ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র ও শিবনাথে পার্থক্য কোথায়? প্রথম ও সহজ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, উভয়েই যখন সমাজের কার্য্যাদি পরিচালনায় নেতৃত্বের আবরণে যথেচ্ছাচারকে প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, তখন হয় ত এই একের যথেচ্ছা-চারের প্রতিবাদ-ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র ও শিবনাথের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আরও একটু ধীরভাবে কেশব-চরিত ও শিবনাথ-চরিত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সামাজিক কার্য্যে এই একের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ-ক্ষেত্রে কেশব ও শিবনাথের প্রকৃতিতে পার্থক্য বিস্তর। কেশবচন্দ্র যখন দেবেন্দ্রনাথের প্রভুত্বকে খর্ব্ব করিতে দণ্ডায়মান হইয়া-ছিলেন, তখন কেশবচন্দ্র নিজের প্রভুত্বাভিমানকে পরিহার করা দূরে থাকুক, বিশেষভাবে জাগ্রত ও উদ্যত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজের কণ্টক দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের কণ্টক উদ্ধারের প্রয়াস করিয়াছিলেন। কি ব্যক্তির শরীরে, কি সমাজ-শরীরে, এরূপ চিকিৎসা যে একেবারে ফলদায়ক হয় না, তাহা নহে। কাজেই ১৮৬৬ খৃঃ ব্রাহ্ম-সমাজশরীরেও একের প্রভুত্বাভিমান দ্বারা অন্যের প্রভুত্বাভিমান দূর করা কথঞ্চিৎ ফলদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রভুত্বাভিমান দূরীভূত হইলেও সমাজশরীরে কেশবচন্দ্রের প্রভুত্বাভিমান অনুপ্রবিষ্ট হইল। সমাজশরীরে কেশবচন্দ্রের প্রভুত্বাভিমান স্থায়ী স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে দিল না। এ বিষেরও ক্রিয়া আরম্ভ হইল। যাঁহারা কেশব-চন্দ্রের সহযোগী হইয়া এক দিন দেবেন্দ্রনাথের যথাচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কালক্রমে শিবনাথের সহযোগী হইয়া কেশবচন্দ্রের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করিলেন। ইহা স্বাভাবিক এবং অনেক দিকে সঙ্গত বটে। কিন্তু এই কথাই আমাদের বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, একের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ-ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ দুই জনে পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী কি না? কেশবচন্দ্রের

প্রকৃতিতে প্রভুত্ব করিবার বীজ, তাহার বিকাশের পথে ও পারিপার্শ্বিক ঘটনায় প্রচুর সুযোগ, অন্যদিকে শিবনাথের প্রকৃতিতে প্রভুত্ব করিবার প্রবল ইচ্ছার বিশেষ অভাব, এবং তাহার বিকাশের পথে অনেক রকম অন্তরায় ছিল বলিয়া, কেশব-চরিত যে ভাবে যে দিক্ দিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছিল, শিবনাথের অন্তঃপ্রকৃতি ও তাঁহার সমসাময়িক বাহিরের ঘটনা তাঁহার জীবনের বিকাশকে কেশবচন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে লইয়া গিয়াছিল। এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলার মধ্যে একটা দুঃসাহস হয় ত বা থাকিতে পারে, তথাপি এ কথা বলা কিছুতেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না যে, কেশবচন্দ্রের প্রকৃতি ও শিবনাথের প্রকৃতি তাঁহাদের স্ব স্ব মূল ভাবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা এত ভিন্ন—এত স্বতন্ত্র, তাহাদের গতি এমন বিপরীত দিকে যে, এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির বিকাশে ইহারা স্বভাবতঃই পরস্পর বিরোধী হইয়া ফুটিতে বাধ্য হইয়াছে। বীজে যাহা পৃথক্, বিকাশের পথে তাহার পার্থক্য অনিবার্য্য।

সমাজের কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র একাধিপত্য করিতে গিয়াছিলেন, কেননা, একাধিপত্য করার বীজ তাঁহাদের প্রকৃতিতেও ছিল, আর তাহা বিকাশ হইবার সুযোগও পাইয়াছিল। স্বভাবতঃ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ (Aristocrat) ত ছিলেনই ; তাঁহাদের একাধিপত্যে যখনই বাধা জন্মিয়াছে, তখনই তাঁহারা, এমন কি, যথেচ্ছাচারী (Autocrat) পর্য্যন্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচরিতের ইহাই মূলভাব। অন্যদিকে শিবনাথ ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশে জন্মিলেও আভিজাত্যের কোন দাবী তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রকৃতিতেও আভিজাত্যের কোন বীজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর দশ জনকে নিজের শাসনাধীনে চাপিয়া রাখিয়া নিজের প্রভুত্বকে অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও তাঁহার মধ্যে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্রকে (Constitutionalism) প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে মানিয়া চলিবার জন্য তাঁহার মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা দেখা গিয়াছে। আর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচালনা-কার্য্যে তিনি যথাশক্তি এই নিয়মতন্ত্রকে আমৃত্যু মানিয়া চলিতে চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী রাজনীতি-শাস্ত্রে যাহাকে ডিমোক্র্যাট্ (Democrat) বা গণতন্ত্রী বলে, পণ্ডিত শিবনাথ পূরাপূরি হয় ত তাহা ছিলেন না। রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারেই একান্তভাবে আবদ্ধ থাকায় এই ডিমোক্র্যাটের ভাব তাঁহার মধ্যে আরও সুস্পষ্টরূপে ফুটিতে পারে নাই। নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রায় একই বস্তু। নিয়মতন্ত্র ব্যতিরেকে গণতন্ত্র, একের পরিবর্ত্তে বহুর যথেচ্ছাচার। আবার গণতন্ত্র ব্যতিরেকে নিয়মতন্ত্র, সমাজের উপর একের বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের একটা নূতন সংস্কৃত উপায় মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে যে নিয়মতন্ত্রের আবরণ দেখা যায়, তাহা আবরণ মাত্র। বস্তুতঃ তাহার অন্তরালে একাধিপত্যই সর্ব্বদা উদ্যত ও জাগ্রত। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র যে নিয়মতন্ত্রকে সমাজের

কার্য্য-পরিচালনার জন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যতটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহাদের স্ব স্ব প্রভুত্বাভিমানের পুরোভাগে একটা উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য যখনই ঝড় উঠিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, এই নিয়মতন্ত্রের পাত্‌লা আবরণখানি ছিঁড়িয়া গিয়া তাহার ভিতরকার প্রভুত্বাভিমান আপনার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সমাজ -নিয়মতন্ত্র বা গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অবশ্য, ইহা পারে নাই বলিয়া যে ইহা অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা নয়। বরং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সমাজ নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা বড়ই অশোভন ও অস্বাভাবিক হইত। কেননা, তাহা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ফুটিবার পথে পদে পদে বাধা পাইত। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সমাজ আমাদের একটা কল্পিত আদর্শানুযায়ী না হইতে পারিলেও, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়াও অস্বাভাবিক হয় নাই।

অন্যদিকে আমরা দেখিলাম, শিবনাথের চরিত্রে নিয়মতন্ত্রকে মানিয়া চলার জন্য একটা স্বাভাবিক প্রেরণাও আছে,আর এই স্বাভাবিকী প্রেরণাকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের সহিত নিয়মতন্ত্রের সঙ্গতি রাখিয়া ইহাকে তিনি আজীবন বিকসিত করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই নিয়মতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া, আচার্য্য শিবনাথ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৯ এই ৪২ বৎসর একাদিক্রমে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে এই কেশব-বিরোধী নূতন সমাজের নেতৃরূপে ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই ৪২ বৎসরের নেতৃত্বের মধ্যে ইতিহাস বা জীবন-চরিতে স্মরণ-যোগ্য কোন প্রতিবাদ তাঁহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই। এইখানেই শিবনাথ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। এইখানেই বলা যাইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যমূলক যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে তিনি একদিন ১৮৭৮ খৃঃ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কেশবের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত নহে; তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কেননা, তাঁহার প্রকৃতিতে সত্যই নিয়মতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল। আর শিবনাথের প্রকৃতিতে নিয়মতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল বলিয়াই ব্রাহ্ম-সমাজের স্রোত কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত আসিয়াই একেবারে থামিয়া যায় নাই, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধারাতেও ইহার আর এক নূতনতর বিকাশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

শিবনাথ-চরিত্রের উপর কেবল বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার অপ-প্রয়োগ করিয়া, ইহাকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, ইহার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইতিহাসে স্মরণ-যোগ্য কোন চরিত-চিত্রকেই সেরূপ করিয়া দেখিলে, ঠিক ঠিক দেখা হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। কাজেই পণ্ডিত শিবনাথের দেহত্যাগের অত্যল্পকালের

মধ্যেই আমরা তাঁহার মূল্যবান্ চরিত-চিত্রখানিকে ইতিহাসের পারম্পর্য্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, তাঁহার চরিতের মূল ও স্থুল ভাবটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রকেই আহ্বান করিতেছি। আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, শিবনাথ-চরিতের মূলভাব দুইটি।

—প্রথম,—ব্যক্তির জীবন সমাজের জীবনেই চরিতার্থতা লাভ করে।

—দ্বিতীয়.—ব্যক্তি সমাজের কার্য্য-পরিচালনায়, নিয়মতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইবে।

এই দুইটিই হয় ত পাশ্চাত্য সমাজ বা রাজনীতির যে কোন প্রাথমিক গ্রন্থে যে কেহ দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পারেন। কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় যাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতার অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে সমস্ত বাঙ্গালী রাষ্ট্রে, প্রাদেশিক ও এমন কি, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক নেতাই, নিয়মতন্ত্রকে জীবনে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

নিয়মতন্ত্রকে সাধনার কথা আমি বলিলাম। বস্তুতঃই এ যুগে ইহা সাধনারই বস্তু। সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের মত একটা প্রাচীন, জীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও শিথিল, এবং সর্ব্বোপরি দরিদ্র জাতিকে এ যুগে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে হইলে, একটা আদর্শের অনুপাতে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। নিয়ম-তন্ত্রের ভিত্তির উপরেই সংঘবদ্ধ হওয়া এ যুগে অধিকতর নিরাপদ্। অবশ্য, সম্পূর্ণভাবে আপদ্‌শূন্য কোন আদর্শই এ পর্য্যন্ত মনুষ্য চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আপদ্-বিপদের মধ্য দিয়াই সমাজকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে এই আপদ্-বিপদ্ যত কম হয়, প্রত্যেক সভ্যদেশের জননায়কগণের তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। পণ্ডিত শিবনাথ নিয়মতন্ত্রের সাধনা করিয়া বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে একটা আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস একদিন পণ্ডিত শিবনাথের এই আদর্শের সুবিচার করিবে, আশা করা যায়।

বাঙ্গলাদেশে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন হইতেই এই নিয়মতন্ত্রের উপর সমাজের বিভিন্ন অংশকে এ যুগে আবার সংহত ও সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অনেক সময় নেতার পক্ষে আত্ম-বিলোপ আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রামমোহন রায়। গণ-তন্ত্রের অনুশাসনে ও নিয়মতন্ত্রের সম্মানার্থে রাজা রামমোহন স্বেচ্ছায় এই হিন্দুকলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে সানন্দে সরিয়া আসিলেন। এইখানে রামমোহন ডিমো-ক্র্যাট্। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র গণতন্ত্রের অনুরোধে রামমোহন-প্রদর্শিত এই প্রকার

আত্মবিলোপ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। রাজা রামমোহন-চরিত্রের এই দিক্‌টা---দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর আমাদের পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ এই জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলারও একজন নেতা। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন নেতা হারাইয়াছে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

মাতৃমূর্ত্তি

১

বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে নামিয়া বন্ধুবরের "—কুটীর" খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। অবশ্য, পাণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করিতে আমাদের যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা বহুদিন মনে থাকিবে। তবে আমাদের সাহেবী পোষাক ও গম্ভীর চাল দেখিয়া বেচারা পাণ্ডাদিগকে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল, সে জন্য পরিণামে আমাদিগকেও একটু যে আপশোষ করিতে না হইয়াছিল, তাহা নহে। কেন, তাহা বলিতেছি।

দেবগৃহের বিচিত্র অশ্বযানে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে বিনয় ও আমি যখন পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ভাবিয়াছিলাম, রাত্রির কষ্ট বন্ধু-গৃহে পৌছিয়াই শেষ হইবে ; কিন্তু ভবিতব্যতা আমাদের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, অবশ্য তাহা কর্ম্মফল ব্যতীত আর কি বলিব?

"—কুটীরে" গাড়ী থামিলে, উভয়ে নামিয়া দেখিলাম, বাড়ীর গেট ত বন্ধই, চারি-দিকের জানালা-দরজাও সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ। দেখিয়াই ত চক্ষু স্থির! ডাকাডাকির পর একজন সাঁওতালী মালী সেখানে আসিল। তাহার নিকট শুনিলাম, আজ এক সপ্তাহ হইল, বন্ধুবর বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পরিবারবর্গ সহ কাশীর বাড়ীতে গিয়াছেন। সেখানে অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ থাকিবেন। আমি গত কল্য যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হয় নাই। আজ সকালে তাহা এখানে পৌছিয়াছে এবং পুনরায় কাশী-ধামে চলিয়া গিয়াছে অথবা যাইবে।

বন্ধুবর আমাকে অনেক দিন হইতেই এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমিও 'শীঘ্র যাইতেছি' এইরূপ ভাবে পত্র লিখিয়া প্রায় দুই মাস কাটাইয়া দিয়াছি। তার পর সহসা কল্য স্থির করিয়াছিলাম যে, এইবার যাইব। জানিতাম, পত্র লিখিলে পরদিন প্রত্যুষেই উহা বন্ধুবরের হস্তগত হইবে, সুতরাং আমরা যখন পৌছিব, তৎপূর্ব্বে আমাদের অভ্যর্থনার সমুদয় আয়োজন ঠিক হইয়া থাকিবে। তখন ত জানিতাম না, আমার সাহেবীয়ানার মধ্যে কতখানি গলদ আছে! গদাইলস্করী চালে চলিতেছিলাম, ভাবিয়া-ছিলাম, একদিন আগে পত্র লিখিলেই যথেষ্ট। অন্যের প্রয়োজন, অথবা সুখ-দুঃখ আছে, এ কথাটা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বারো আনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেটা আজ 'ফাঁরে' পড়িয়া একটু বুঝিতে পারিলাম বৈ কি!

এখন উপায়? নিজের জন্য ততটা বিব্রত নহি, কিন্তু বিনয়কে সঙ্গে আনিয়াই ত গোলে পড়িয়াছি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ী তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি, তাহাকে এ অবস্থায় এখন কোথায় লইয়া গিয়া অভ্যর্থনা করি? আমি যে কত বড় বেয়াকুব, বোধ হয়, বিনয় তাহা মনে করিয়া হাসিতেছে। তাহার পরিচিত দুই চারি জন আত্মীয় দেওঘরে আছেন জানিয়াও সে তাঁহাদিগকে কোন সংবাদ দেয় নাই। আমার সঙ্গে নিঃসংশয়ে আসিতেছে বলিয়া, দেওঘরের কোন্ অংশে তাঁহারা আছেন, সে সংবাদ পর্য্যন্ত সে লয় নাই। আমিই তাহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিয়াছিলাম, আমার সতীর্থ এবং বাল্যবন্ধু হইলেও, বন্ধুবর—র ও সে অপরিচিত নহে। সুতরাং এখানে বেশ আনন্দে ও আয়াসে কয়টা দিন কাটাইতে পারিব বলিয়াই আমি তাহাকে এখানে সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

মালী আমাকে চিনিত না। অপরিচিত দুইটি বাবুকে বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেও তাহার সাঁওতালী বুদ্ধি খুলিল না। তবে বন্ধুবরের বাড়ীর মেয়ে-ছেলেদের নাম করিতে এবং আমরা তাঁহার অতিথি, এ কথাটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে, অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বাহিরের একটি ঘর খুলিয়া দিল। অবশ্য, বক্‌শিসের কিছু লোভ যে তাহাকে না দেখাইয়াছিলাম, তাহা নহে।

বিছানাপত্র ও গ্লাডোষ্টোন্ ব্যাগ দুইটি গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলাম। বিনয় এ সকল বিষয়ে আমার অপেক্ষা বেশী কাজের লোক। সে ব্যাপারটি সবই বুঝিয়া লইয়াছিল। পাছে আমি বিশেষ দুঃখিত হই, এ জন্য সে প্রফুল্লভাবে অবস্থাটার মধ্যে অনেকটা কাব্য এবং কল্পনার আরোপ করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিল। তার পর স্নানের পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্তের জোগাড় করার দিকেই সে বিশেষ ঝোঁক প্রকাশ করিল। মালীর দ্বারা কতদূর সুবিধা হইবে, তাহা সে বুঝিয়া লইয়াছিল। সে বলিল, "স্নান এখন থাক, চল, বাজার হইতে দেখিয়া শুনিয়া কিছু ভাল রকম খাবার আনা যাক্।"

বাজার!—ওঃ! সে ত প্রায় এক মাইল পথ। গাড়ীটা তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভাড়া তখনও দেওয়া হয় নাই। দরজায় চাবি দিয়া, মালীকে সব কথা বলিয়া গাড়ী চড়িলাম। কর্ম্মভোগ অনেক আছে দেখিতেছি।

কিছু বক্‌শিস্ পাইয়া মালী এবার কিছু আত্মীয়তা প্রকাশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলে সে আমাদের স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।

বিনয় বলিল যে, পাণ্ডাদিগকে বিদায় না দিলে এ সকল দুর্ভোগ ঘটিত না। তাহারা আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিত। বুঝিলাম, কিন্তু "এ যে হস্তচ্যুত পাশা।"

২

বাজারের কাছে গাড়ী রাখিয়া "মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার" হইতে সে বেলার মত কিছু খাবার কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইব, এমন সময় বিনয় ও আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

ফিরিয়া দেখিলাম, ভবতোষ বাবু। তাঁহাকে দেখিয়াই বিনয় বলিল, "তুমি এখানে?"

বিনয়ের সহিত ভবতোষের কুটুম্বিতা ছিল, তাহা আমিও জানিতাম।

"আমার ভগিনী এখানে আছেন, 'উইলিয়মস্ টাউনে বাড়ী। আজ পাঁচ দিন আসিয়াছি। তোমরা এ সময়ে কোথায়? হাতে খাবার—ব্যাপার কি? কবে আসিলে?"

প্রশ্ন অনেকগুলি। ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলাম। ভবতোষ ঠিক সহপাঠী নহেন। তবে বহুদিন হইতে তাঁহার সহিত জানাশুনা আছে। বিনয়ের আত্মীয় ও বন্ধু, সেই সূত্রে আলাপ-পরিচয় ছিল।

ভবতোষ বলিলেন, "মন্দিরে গিয়াছিলাম। আপনাদের বাড়ী ছাড়াইয়া আমাকে যাইতে হইবে। চলুন, আপনাদের বাসা দেখিয়া যাই।"

গাড়ীতেই ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া ভবতোষ বাবু আমাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সংক্ষেপেই বলিলেন, "আমার ভগিনীর পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আমাদের ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করিবার নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনাদিগকে যাইতেই হইবে। বিনয়, তোমার ত কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না, কারণ, তিনি তোমারও আত্মীয়।"

বিনয় সোৎসাহে বলিল, "আমি ত তোমাদের ওখানে প্রথমে সংবাদ দিতেই চাহিয়াছিলাম। তবে ঠিকানা জানা ছিল না। আর সুরেশ আমাকে পত্র লিখিতেই দেয় নাই. তাই ত এমন কর্ম্মভোগ করিতে হইল।"

আমার দিকে ফিরিয়া ভবতোষ বলিলেন, "তবে আর আপত্তি করিবেন না সুরেশ বাবু। জিনিসপত্র থাক, চাকরেরা আসিয়া লইয়া যাইবে। আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ এখানে কর্ম্মভোগ করার অপেক্ষা ভবতোষ বাবুদের ওখানে পরম সুখেই থাকিতে পাইব। তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং অতিথিবৎসল। বিশেষতঃ বিনয়ের নিকট ভবতোষ বাবুর ভগিনীর যথেষ্ট সুখ্যাতির সংবাদ আমি শুনিয়াছিলাম। তথাপি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, "ভবতোষ বাবু, আপনাদের ওখানে যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে আপনাদের বাড়ীর মহিলারা এ জন্য বিব্রত হইয়া পড়িতে পারেন, তাঁহারা ত বাহিরের লোকের সম্মুখে বাহির হইবেন না?"

প্রশান্তভাবে ভবতোষ বলিলেন, "না, তা তাঁরা বোধ হয় করিবেন না। কিন্তু সে জন্য তাঁরা বিব্রতও হইবেন না। কারণ, এ অভ্যাস ত হিন্দুর ঘরের মেয়েদের আজ নূতন নহে।"

এখানে কথাটা বলিয়া রাখা ভাল, পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মমত পিতৃদেবই

সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং আমিও সেই মতাবলম্বী। পর্দ্দার অনুশাসন একেবারে উড়াইয়া দিবার পক্ষপাতী না হইলেও, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ অতিথি গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সম্মুখে উহার বহর বাড়াইবার কোনই প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করিতাম না।

আমি বলিলাম, "বাড়ীর মহিলারা সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া বেড়াইবেন, এ অবস্থাটা আমি আদৌ পছন্দ করি না, ভবতোষ বাবু। তবে শুনিয়াছি, আপনার ভগিনী সুশিক্ষিতা এবং আলোকপ্রাপ্তা। সুতরাং—"

বাধা দিয়া অতি বিনয়-নম্র স্বরে ভবতোষ বলিলেন, "মাপ করিবেন, সুরেশ বাবু, আলোকপ্রাপ্তা কথাটা আমার ভগিনী শুনিলে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কেন? আমি ত কোন মন্দ কথা বলি নাই। অর্থাৎ তিনি কুসংস্কারবর্জ্জিতা এবং আধুনিক ভাবাপন্না, এ কথা বলায় কি তাঁহার কোনও অসম্মান করা হইল?"

সহাস্যে ভবতোষ বলিলেন, "তা হইল বৈ কি, সুরেশ বাবু। তিনি হিন্দু বিধবা। যদি তাঁহার প্রতি ঐরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়, তবে তিনি নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পারেন। উহার অর্থ যে, তিনি বিধবা হইয়াও হিন্দুর কুসংস্কার মানেন না, অর্থাৎ, মৎস্য, মাংস প্রভৃতিতেও তাঁহার অরুচি নাই ইত্যাদি নানা প্রকার কথা মনে করা যাইতে পারে বৈ কি।"

আমি বলিলাম, "তিনি সুশিক্ষিতা এবং আধুনিকভাবে অনুপ্রাণিতা হইলে ও সকল বিষয় মানিবেন কেন?"

দেখিলাম, বিনয় একটু অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ভবতোষ বাবুর বাহিরে কোনও চাঞ্চল্য দেখিলাম না, কিন্তু তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "থাক্, এ বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোনও হিন্দু বিধবা শিক্ষিত হইলেও, যাহাকে আপনারা কুসংস্কার বলেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে রাজি নহেন। আমার ভগিনী সুশিক্ষিতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কায়মনোবাক্যে হিন্দু। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল মন্তব্য প্রকাশ করিলে, তিনি উহা প্রশংসার কথা বলিয়া আদৌ মনে করিবেন না।"

আমি তখন মনে মনে একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বলিলাম, "তিনি যখন নিষ্ঠাবতী হিন্দু, তখন আমার মত অহিন্দু তাঁহার গৃহে অতিথি হইবে কিরূপে?"

উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিয়া ভবতোষ বলিলেন, "সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। তাঁহাকে শুচিবাতিকগ্রস্ত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। আমার ভগিনী মানুষকে মানুষের ভাবেই দেখেন।"

বাঁকিয়া বসিয়াছিলাম বটে; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ভবতোষ বাবু আমাকে আতিথ্যগ্রহণে বাধ্য করিলেন।

৩

নির্ব্বোধের কার্য্য করি নাই। এ আতিথ্য গ্রহণ না করিলে দেওঘরে একদিনের বেশী থাকিতে পারিতাম না। ভবতোষ বাবুদের এখানে আসিয়া পরম সুখেই দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল। প্রকাণ্ড বাড়ী। দাস-দাসীরও অভাব নাই। পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি ছিল না। নিষিদ্ধ পক্ষিডিম্ব বা মাংস এবং চা এই কয়েকটির অভাব ছিল বটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ গৃহে প্রস্তুত উপাদেয় তাজা খাবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাইতাম। বিশেষতঃ অপরাহ্নের দিকে নানাপ্রকার ফলমূলেরও আয়োজন ছিল।

এই নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা নিজে সকল প্রকার ভোগবিলাস হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, সে সংবাদও জানিতে পারিলাম। কিন্তু স্বামী যে সকল খাদ্য ভালবাসিতেন, প্রত্যহ তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রুদ্ধগৃহে স্বামীর উদ্দেশে তাহা নাকি নিবেদন করিয়া থাকেন। আর সেই সকল ফলমুল, আহার্য্য গৃহের দাস-দাসী পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারার্থ পাইয়া থাকে। স্বামীর বিপুল অর্থ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এই বিধবার সেবাপরায়ণা-ভাব এবং সকল বিষয়ে অনাসক্তির পরিচয় পাইয়া সত্যই আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। এক একবার মনে হইত, ব্যাপারটা যেন খুব বাড়াবাড়ির দিকেই গিয়াছে।

আর একটা বিষয় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালসার নরনারীর সংখ্যা এখানে প্রত্যহই যেন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ছিন্ন, দুর্গন্ধ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কোনরূপে লজ্জা রক্ষা করিয়া বুভুক্ষু কৃষ্ণকায় নরনারী পথে ভিক্ষার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ দৃশ্য প্রত্যহই দৃষ্টিগোচর হইবেই। সে দৃশ্য শোচনীয়, বীভৎস! বাড়ীতে বসিয়া আছি, অমনই ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ শতবার ভিখারীর কাতর কণ্ঠ বিশ্রামের আনন্দটুকু হরণ করিয়া লইবে। এ কি জঞ্জাল!

ভবতোষ বাবু দেখিলাম, এখানকার উৎসাহী কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত যোগ দিয়া সাঁওতাল পরগণার অনশনক্লিষ্ট অস্থিপঞ্জরসার নরনারীগুলির বিহিত ব্যবস্থার চেষ্টায় আছেন। কার্য্যটা ভাল, পথে-ঘাটে ভিখারীর উৎপাতটা কমিয়া যাওয়া দরকার। আর সত্য বলিতে কি, দিবারাত্রি এ সকল দৃশ্য দেখাও যায় না।

আমাদের এই বাড়ীটি ত একটা অতিথিশালা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যহই অন্ততঃ বিশ পঁচিশটি ভিক্ষুক এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য পাইয়া থাকে। পানের খিলিটি পর্য্যন্ত তাহাদের বাদ যায় না।

৪

বেড়াইয়া আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, গতরাত্রিতে দাতব্যচিকিৎসালয়ের অনতিদূরে সহরের মধ্যে একটি কুটীরে দুইটি অভুক্ত নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় না কি মরিয়া পড়িয়া

আছে। শুনিলাম, তাহার পার্শ্বেই দেওঘরের একজন বড় ডাক্তারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এ সংবাদে দেখিলাম, দেওঘর যেন চকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবগৃহে দুর্ভিক্ষ! অনশনে মানুষ না খাইয়া মরিবে! স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের কেহ কেহ পুলিশের নিকট এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। পুলিশ সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, মানুষের মৃত্যু সত্য এবং দুর্ভিক্ষই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ তাহাদের উপর নাই।

কয়েক দিনের আন্দোলনের ফলে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তদন্তে আসিবেন স্থির হইয়াছে। ভবতোষ বাবু ও বিনয় দেখিতেছি আন্দোলনকারীদিগের দলে রীতিমত মিশিয়া গিয়াছেন। ভবতোষ বাবুকে দেখিলাম, বিশেষ উৎসাহী সভ্য।

আমিও যে সে দলের সঙ্গে একটু আধটু না ঘুরিতাম, তাহা নহে। তবে বাঙ্গালার বাহিরের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য বাঙ্গালীকেও যে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে, এ কোন্ কথা? সাঁওতাল পরগণা বেহারের অন্তর্গত, বিহারীরা এ বিষয়ে উদাসীন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "মানুষ ত সব জায়গায়ই মানুষ। না খাওয়াও সর্ব্বত্রই সমান। সুতরাং পরগণা বা প্রদেশ বিবেচনা করিয়া কোন্ মানুষের কোন্ দেশে কোন্ কাজ করা উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গেলে কাজ আর হয় না। বিশেষতঃ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যদি জাতিবিচার করিয়া কাজ করিতে চায়, তবে তাহাকে মানুষ বলা যায় কি?"

সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। উত্তর বিশেষ কিছু ছিল না।

নগর পরিচ্ছন্ন হইতেছে। রাজকর্ম্মচারী তদন্তে আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতেছে। নগরের সর্ব্বত্র তিনি পরিদর্শন করিবেন। মিউনিসিপালিটী চারিদিক্ সুপরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিতদর্শন অনশনক্লিষ্ট নরনারী বা ভিক্ষুকগণ যাহাতে তাঁহারা বিশ্রামভবনের ত্রিসীমায় অথবা তাঁহার পরিদর্শন ক্ষেত্রের সন্নিকটে আসিতে না পারে, সেরূপ আয়োজনও হইতেছে দেখিলাম। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। দেবতার নিকট সকলের অবারিতদ্বার হইতে পারে; কিন্তু রাজা অথবা তাঁহার যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহাদের নিকট সকলের, বিশেষতঃ যাহারা দুরদৃষ্টের ছাপ লইয়া বিশ্বে আসিয়াছে, তাহাদের উপস্থিতি বিংশশতাব্দীর সভ্যতানুমোদিত হইবে কি?

বন্দোবস্ত দেখিয়া অন্যের মনে কি হইতেছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে আমি যে বিশেষ সুখী হইয়াছিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত নই। দেওঘর স্বভাবতই পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর; রাজকর্ম্মচারীর আগমন উপলক্ষে উহা আরও মনোরম শ্রীধারণ করিয়াছিল।

প্রভাতে উঠিয়া ডাক-বাংলার দিকেই চলিলাম। রাজকর্ম্মচারী সেইখানেই উঠিয়াছেন। তিনি ত নগরে আসিয়া শান্তি ও মধুর শ্রীই লক্ষ্য করিয়াছেন দুর্ভিক্ষ কোথায়?

ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে তাঁহার চক্ষে অনশনক্লিষ্ট, বিবস্ত্র নরনারীর চিত্র পতিত হয় নাই, বুভুক্ষু নরনারীর কাতর ক্রন্দন তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই।

সঙ্গে বিনয় ও ভবতোষ বাবু উভয়েই ছিলেন। মিশন হাউস পার হইয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, এক ব্যক্তি দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে শত শত বুভুক্ষু, কঙ্কালসার নরনারী, বালকবালিকা আসিতেছে। তাহাদের মুখে "দোহাই সরকার, খেতে দাও" শুধু এই শব্দই শুনিতে পাইলাম। অগ্রে যিনি আসিতেছেন, তিনি বাঙ্গালী। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তিনি, দেবগৃহে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে কি না, তাহার তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিবস উক্ত রাক্ষসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণাই হয় নাই। কিন্তু কাহার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে আজ প্রভাতেই তাঁহার অবস্থান-গৃহের চারিপার্শ্বে শত শত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ভদ্রলোকের মুখভঙ্গি এবং দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি কোনওরূপে এই ইন্দ্রজালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান!

ভবতোষ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'মজা ত মন্দ নয়। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া এই সকল বুভুক্ষু নরনারী এখানে আসিল কিরূপে?"

বিনয় বলিল, "তাই ত! কাল সমস্ত দিন একটি ভিখারীকেও দেখা যায় নাই!"

আমার ত বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। বাস্তবিক এতগুলি অনশনক্লিষ্ট লোক যে আছে, এ ধারণা আমারও পূর্ব্বে ছিল না।

বাসায় ফিরিবার সময় শুনিলাম, রাজকর্ম্মচারী এইমাত্র এ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এত আয়োজন সবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। দেবগৃহে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে, উহা এতদিন পরে প্রমাণিত হইয়া গেল।

৫

অনেক চেষ্টার পর বিনয় ও ভবতোষ বাবুকে সঙ্গে লইয়া আজ অতি প্রত্যূষেই "হরলা ঝুরি" দেখিতে গিয়াছিলাম। চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিবার মত উৎসাহ ভবতোষ বাবুর আদৌ নাই দেখিলাম। অথচ বাজে কাজে অর্থাৎ সভাসমিতি, দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায় এ সকল কার্য্যে তাঁহার আলস্য নাই। প্রকৃতির মাধুর্য্য, বৈচিত্র্য এ সব উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, জানি না, কিন্তু প্রবৃত্তি যে নাই, তাহা নিশ্চয়ই বলিব।

আমরা যখন ফিরিলাম, তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। শিবগঙ্গার নিকটে আসিয়া জনতা দেখিয়া আমাদের কৌতূহল জন্মিল। আজ ত বিশেষ কোনও উৎসবের দিন নহে, সুতরাং এত জনতার কারণ কি?

নিকটে আসিয়া দেখিলাম, শত শত অস্থিচর্ম্মসার নরনারী বৃক্ষতলে সারি দিয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে মৃৎপাত্র। দেখিলাম, অনেকগুলি বৃহদাকার জালার মত পাত্র। তন্মধ্য হইতে সাবধানে ঘোল লইয়া অনেকগুলি ব্যক্তি সেই বুভুক্ষু নরনারীদিগের মৃৎপাত্রে ঢালিয়া দিতেছে। তাহারা প্রাণ ভরিয়া সকলেই উহা পান করিতেছে। সবিস্ময়ে দেখিলাম, কাহারও অঙ্গে ছিন্নবস্ত্র নাই। প্রত্যেকেই নববস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

শুভ্রবসনা এক নারী-মূর্ত্তি দেখিলাম। একটি বৃক্ষতলে কয়েকটি রুগ্ন বালক বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ডের উপর বসিয়া আছে, আর শুভ্রবসনা সেই নারী সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই মহিলাটিকে দেখিয়াই আমরা তটস্থ হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে কোনও দিন পথে, মাঠে বেড়াইতে দেখি নাই। কোনও দিন সাহস করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহি নাই। কিন্তু তিনি অপরিচিতা নহেন। আমরা সকলে তাঁহারই অতিথি।

ভবতোষ বাবুকে দেখিয়াই তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "দাদা, এ দিকে এস। ঐ গাছ-তলায় ডাক্তার বাবু আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তাঁর হাঁসপাতালে স্থান না হয়, তবে আমাদের পাশের বাড়ীটা খালি আছে, সেখানে আমি এই রুগ্ন বালকগুলিকে নিয়ে যেতে চাই, তিনি চিকিৎসা করিতে পার্‌বেন কি না?"

ভবতোষ বাবু দ্রুতপদে যাইতেছিলেন, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, "যদি তিনি না পারেন, অন্য ডাক্তার আনিব। খরচ যা লাগে, সব আমিই দিব—এ কথাটা বুঝাইয়া দিও।"

তিন জনেই ডাক্তারের নিকটে গেলাম। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সত্য বলিতে কি ভবতোষ বাবু, আপনার ভগিনীর বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইয়াছি। এই সকল পুরুষ ও স্ত্রী পাঁচ সাত দিন উপবাসী। অনশন অনেক দিন হইতেই চলিয়াছে, তবে পাঁচ সাত দিন পেটে কিছুই পড়ে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় ইহারা অন্য খাদ্য পাইলে এখনই তাহার ফলে বিসূচিকায় হয় ত আক্রান্ত হইত। এ সময়ে ঘোল দিয়া তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। এ জন্য বাস্তবিকই আমি শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ভবতোষ বাবুর নিকট অন্যান্য কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সরকারী হাঁসপাতালে যে কয়টি স্থান আছে, তাহাতে সব কুলাইবে না। তা যে কয়টি ধরে, আমি সেখানে ব্যবস্থা করিয়া দিব। আর বাকিগুলির জন্য আপনারা আমায় যেখানে যাইতে বলিবেন, সেইখানে যাইব। এজন্য আমি চিকিৎসক হিসাবে এক পয়সাও লইব না।"

ফিরিয়া বটবৃক্ষমূলে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া একটি রুগ্ন শিশুকে কোলে তুলিয়া পথ্য দিতেছেন।

ভবতোষ বাবু আমার বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া একটু হাসিলেন। তার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "হিন্দুর মেয়ে আলোক না পাইয়া এ সব—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "মাপ করিবেন, ভবতোষ বাবু, আপনি সে দিনের কথাটা এখনও মনে করিয়া রাখিয়াছেন দেখিতেছি। কিন্তু আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, পাশ্চাত্যভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য আলোক না পাইলে মানব-জন্ম বৃথা হয়, আর হিন্দুর ঘরের মেয়েদের উপর ততটা আস্থাও ছিল না। কিন্তু আজ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, সেটা আমার মস্ত ভুল। চাঁদার খাতায় সহি করিয়া দানের মহিমা প্রচার করা এক জিনিস, আর প্রকৃত সেবা-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রাণের আবেগে তাহা পালন করা আর।"

ভক্তিভরে সেই মহিমময়ী মাতার দেবীমূর্ত্তি-উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

নববস্ত্র-মণ্ডিত দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নর-নারীর দল পরিতৃপ্ত চিত্তে জয়ধ্বনি করিতেছিল। তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত জয়ধ্বনি বায়ুমণ্ডল কম্পিত করিয়া "বৈদ্যনাথের" চরণতলে পৌছিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু যিনি আজ এতগুলি নিরন্নের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন, বিবস্ত্রের লজ্জা রক্ষা করিলেন, তাঁহার মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

ভগিনীর নির্দ্দেশক্রমে ভবতোষ বাবু উচ্চকণ্ঠে সকলকে বলিলেন, "কাল হইতে সকলে '—কুটীরে' যেও। সেখানে তোমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে।"

তখন সেই তিন চারি শত নর-নারীর কণ্ঠোত্থিত জয়গানে আর সকল শব্দ ডুবিয়া গেল। অদূরে শতশত দর্শক এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহারাও সেই জয়গানে যোগদান করিল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমিও চীৎকার করিয়া বলিলাম, "মা, তোমরা আছ, তাই বাঙ্গালা এখনও একেবারে উৎসন্ন যায় নাই। তোমাদের আশীর্ব্বাদে এখনও তাই বাঙ্গালাতেও মাঝে মাঝে দুই একটা মানুষ দেখা যায়।"

ভবতোষ বাবু আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বেলা গড়িয়ে গিয়াছে সুরেশ বাবু, চলুন বাসায় যাই।"

"চলুন যাই। আজ আপনার ভগিনীর চরণধূলি লইয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা হইতেছে। সারা দেওঘর যাহা করিতে পারে নাই, আপনার ভগিনী একা তাহা করিয়াছেন।"

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মাথাটা আজ ভাল নাই। আমার ভগিনী আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা শুনিলে তিনি লজ্জা পাইবেন।"

লজ্জা।—লজ্জা ত আমারই হওয়া উচিত।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উপগুপ্ত

সম্রাট্ অশোকের ধর্ম্মোপদেষ্টা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যশস্বী, মহাস্থবির, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বারাণসীবাসী [মতান্তরে মথুরা বা চালী (পাটলীপুত্র) নিবাসী] গুপ্তনামক বৈশ্যবংশোদ্ভব কোনও সুগন্ধ দ্রব্য-বিক্রেতার পুত্র। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উপগুপ্ত উপনামক ব্যক্তির ঔরসে মচ্ছদেবী বা মৎস্যদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতীয় মৎস্যগন্ধা-বৃত্তান্তের বৌদ্ধরূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। (Bulletin L'ozoole Francaise d'Extreme orient Tome IV 1904) সতর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়েন। ইহা শাক্য মুনির নির্ব্বাণলাভের ১১০ বৎসরের পরের ঘটনা। বৈশালী বিহারের সঙ্ঘপতি যশস্ বা যশেক নামক অর্হৎ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রব্রজ্যা-গ্রহণের তিন বৎসর পরে তিনিও বিশিষ্ট অর্হৎ পদে উন্নীত হয়েন এবং লক্ষণাদিশূন্য বুদ্ধরূপে পরিগণিত হইয়া বহু নরনারীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে উপগুপ্তের স্থান বিশেষ উচ্চে অবস্থিত। তিব্বতের লামা তারানাথ লিখিয়াছেন যে, তথাগতের মৃত্যুর পর অপর কোনও ব্যক্তি ইঁহার ন্যায় জীবের উপকারসাধন করিতে পারেন নাই। উপগুপ্তের আবির্ভাব সম্বন্ধে বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দ যে পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এ প্রবাদও শুনা যায়। রক্‌হীল (Rookhill) সাহেব তাঁহার বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। উপগুপ্ত স্থবির-পদ লাভ করিয়া বিনয় পিটকের সরল নীতিকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আধুনিক ভাগলপুরের অন্তর্গত চম্পা নগরীতে বৌদ্ধ-সমাজের তৃতীয় নেতা শাণবাসিক দেহ রক্ষা করিলে, উপগুপ্তই তাঁহার স্থান অধিকার করেন এবং নিদাঘবিশীর্ণা গঙ্গা (মতান্তরে বর্ণল) নদী অতিক্রম করিয়া তীরভুক্তি বা আধুনিক ত্রিহুত জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিদেহ-প্রদেশে (বর্ত্তমান বেথিয়ায় Bothiah) গমন পূর্ব্বক বসুসার নামক কোনও গৃহস্থ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামে স্বল্পকাল অবস্থিতি করেন। তথা হইতে গন্ধ-গান্ধার বা গন্ধমাদন-পর্ব্বতে, গমন করিয়া বহু ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পরে মধ্যদেশের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে মথুরা নগরীতে গমন করিয়া শির বা উশির (মতান্তরে মুরুন্ড) পর্ব্বতের শিরোদেশে নট ও ভট্ট নামক দুই জন বণিক্ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত আশ্রমে অবস্থান করিতে থাকেন। এইখানে নর্ত্তকরূপী মার (বৌদ্ধ শয়তান) ও তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত

হইয়া নাগরিকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট 'উপসম্পদা" গ্রহণ করেন। উপগুপ্তের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সানুচর মারকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। উপগুপ্তের প্রদত্ত মাল্যদান মার ও মার সৈন্যের গলদেশে শবাকারে সংলগ্ন হইয়া যায়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সকল শব-মাল্য দূরীভূত করিতে না পারিয়া তাহারা উপগুপ্তের শরণাপন্ন হইলে, মহাস্থবির ভবিষ্যতে অপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে, এই অঙ্গীকারে তাহাদিগকে শববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। মথুরার গণমূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে যে সকল নর্ত্তনশীল প্রস্তরখোদিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হয় তো 'মার' সহচরীদিগেরই চিত্ররূপে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। তবে কেহ কেহ এ কথা বলিয়া থাকেন যে, এগুলি জড়বস্তু বা জড় প্রকৃতির উপর শক্তির ক্রিয়াদ্যোতক (Energy acting on matter) অশ্বঘোষ-লিখিত অবদানে উপগুপ্ত কর্তৃক 'মার-বিজয়' কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপগুপ্তকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া মার তাঁহার শিরোদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। ধ্যানাবসানে উপগুপ্ত নিজ মস্তকে মাল্য ধারণ করিয়া আছেন দেখিয়া পুনরায় সমাধিমগ্ন হইলেন। ধ্যানাবস্থায় জানিতে পারিলেন যে, এ কার্য্য মারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মারকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশে তিনি মারের কণ্ঠে শবদেহ সংলগ্ন করাইয়া দেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে কোথাও এ বন্ধন মুক্ত হইল না। অবশেষে মার উপগুপ্তের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলে, তিনি তাহাকে এই অনুক্ষণ শবস্পর্শন হইতে মুক্তিদান করে। উপগুপ্তের অনুরোধে মার বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধদেবের সকল দৈহিক চিহ্নগুলি দেখাইতে স্বীকার করে। পরে মার কর্তৃক বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি পরিগৃহীত হইলে উপগুপ্ত ভক্তির আতিশয্যে তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া পড়েন। এই সময় হঠাৎ ভীষণ ঝটিকার আবির্ভাব হয়।

মতান্তরে ইহাও কথিত হইয়া থাকে যে, অশোকের ধর্ম্মসাধনে বিঘ্ন প্রদান করার জন্য উপগুপ্ত মার বা সয়তানরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। Upagutta butter contre mara pour prote'ger us exercices dep'ete d'Asoka troubles parole Malin.

উপগুপ্তের মথুরাই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। বোধিসত্ত্বাবধান কল্পনার যে পূত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী-স্পর্শে 'অভিসার' নামে বঙ্গ-সাহিত্যে স্মরণীয় স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও ঘটনাস্থল মথুরা নগরী। চীন-ভ্রমণকারী ইউয়েন চাং ও তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ উভয়েই লিখিয়াছেন যে, মথুরায় অবস্থানকালে উপগুপ্ত তাঁহার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে কোনও গুহামধ্যে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে সমগ্র গুহাটি কাষ্ঠ-খণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে যে, মথুরায় তিনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মথুরা হইতে স্থবিরপ্রবর অপরান্ত বা সিন্ধুদেশে গমন করেন।

তদ্দেশীয় রাজার নাম মহেন্দ্র ও তাঁহার পুত্রের নাম চমশ। বগল নামক স্থানের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে হংসকুঞ্জ নামক স্থানে হংস-সংঘরাম নামধেয় একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ইউয়েন চাং লিখিয়াছেন যে, উপগুপ্ত লবণের জন্য প্রসিদ্ধ সিন্ধুদেশে বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে উপগুপ্তের সমুদ্রে বাস-বিষয়ক যে প্রবাদ আছে, তাহা বোধ হয়, তাঁহার এই "সিন্ধু"-বাস-বৃত্তান্তের ভ্রমাত্মক অর্থগ্রহণফলেই কল্পিত হইয়াছে। কালচক্র নামক পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উপগুপ্ত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাবলে কাশ্মীরদেশে গমন করিয়া তথায় মাসত্রয় অবস্থিতি করেন এবং তদ্দেশে এক সুদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রস্তরখণ্ড লাট বা অশোক স্তম্ভ বলিয়াই অনুমিত হয়। কাশ্মীরে অবস্থানকালে তিনি বহুবার তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভূকম্পন ও বিদ্যুৎস্ফুরণের মধ্যে তিনি হ্রদের জলে প্রবেশ করিয়া নাগরাজের নিলয়ে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্ধান হইয়া যান। এই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার জন্যই বোধ হয় আধুনিক স্থবির ও দক্ষিণদেশীয় 'গোঁড়া' বৌদ্ধগণ উপগুপ্তকে কতকটা ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়াই মনে করেন। মৌদ্গল্যায়নও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং বুদ্ধদেবের সহচর ছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐ দোষ কতকটা কাটিয়া গিয়া থাকিবে। উপগুপ্ত কিছুদিন পাটলীপুত্র নগরেও অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মথুরার আশ্রমের ন্যায় পাটলীপুত্রের আশ্রমটিও একটি ক্ষুদ্রাকার শৈলের শিরোদেশে অবস্থিত ছিল। আধুনিক পাটনার দক্ষিণভাগে "ছোটা পাহাড়ী" নামক যে কৃত্রিম পাহাড় আছে, তাহাই ওয়াডেল-(Waddell) প্রমুখ পণ্ডিতগণ উপগুপ্ত-অধ্যুষিত শৈল বলিয়া অনুমান করেন।

চৈনিক বর্ণনামতে মহারাজ অশোক উপগুপ্তের নিকটেই দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং উপগুপ্তের পরামর্শমতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্তূপ ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের এই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। কুক্কুটারাম নামক বিখ্যাত সঙ্ঘারামই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়। দিব্যাবদান গ্রন্থে অশোক ও উপগুপ্তের যে কথোপকথন ও আলোচনাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই কুক্কুটারামেই ঘটিয়াছিল। তারানাথের মতে উপগুপ্ত অশোকের প্রায় 'এক পুরুষ' আগে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নেপালী ও চীনদেশীয় বিবরণাদিতে উপগুপ্ত প্রধান স্থবির ও অশোকের পাটলীপুত্রস্থ প্রধান উপদেশকরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

দিব্যাবদানমতে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ এবং তৎকর্তৃক ধাতুগর্ভ স্তূপাদি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে উপগুপ্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। সে যাহা হউক, বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থানসমূহে সম্রাট্ অশোকের তীর্থদর্শনকালে যে সুমহান্ স্থাপত্য চিহ্নাদি সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সে সমস্ত স্তূপাদির শিল্পনৈপুণ্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরবর্ত্তী

যুগের লোকেরা উহা জীন্ বা দৈত্যগণের কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিত, সেই তীর্থভ্রমণ ও তৎসম্পর্কিত কার্য্যকলাপে অশোকের সহিত উপগুপ্তের নামও বিশেষভাবে বিজড়িত।

কথিত আছে যে, মহারাজ অশোক স্থবির যশসের অনুরোধে উপগুপ্তকে পাটলীপুত্রে আহ্বান করেন। মথুরা হইতে পাটনা পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ সন্ন্যাসিপ্রবর নৌকা-যোগেই অতিক্রম করেন। উপগুপ্ত রাজধানীতে আগমন করিলে, অশোক তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভ্যর্থনা করেন এবং তথাগতের সহিত তাঁহার সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া মিনতি সহকারে বলিতে থাকেন, "আপনি বিশ্বের একমাত্র জ্ঞান-চক্ষু, সদ্ধর্ম্মের প্রধান ব্যাখ্যাতা, আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়, আপনি আদেশ করুন, আমি সত্বরই আপনার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিব।" মহাস্থবির তদুত্তরে কহিলেন, "হে মহারাজ! ভগবান্ তথাগত আমাকে ও আপনাকে ধর্ম্মের ন্যাসরক্ষকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাগত নরদেহ ধারণ করিয়া শিষ্যবর্গের মধ্যে অবস্থিতিকালে তৎসংক্রান্ত যাহা উত্তরাধিকারিত্বে সংক্রমিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের সযত্নে সংরক্ষণ করাই কর্ত্তব্য।" রাজা স্থবিরের পাদদেশে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "হে স্থবির, আমারও এই অভিপ্রায়, সুদূরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরার উপকার হেতু তথাগত যে সকল স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে গমন করিয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান প্রদর্শনার্থ কোনও প্রকার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।"

তৎপরে মহারাজ উপগুপ্তের সমভিব্যাহারে পুষ্পমালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত উপকরণ সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। এই উপলক্ষে চারিদল সৈন্য শরীররক্ষিরূপে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। উপগুপ্ত তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম লুম্বিনী বনে লইয়া যাইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, ভগবান্ এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইখানেই তাঁহার স্মরণার্থ প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।' নৃপতি অশোক স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া তথায় একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডাঃ ফুরের (Dr, Fuhrer) নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত রুম্মিনদেই নামক স্থানে অশোকের এই স্তম্ভটি ১৮৯৬ সালে আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার-কালে স্তম্ভগাত্রস্থ লিপিটি সদ্যোৎকীর্ণ লিপির ন্যায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। ডাঃ বুলার এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৮৯৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে টাইম্‌স পত্রিকায় ইহার যে অনুবাদ প্রকাশিত করেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যা-রোহণের বিশ বৎসর পরে প্রিয়দর্শী স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়া পূজার্চ্চনা করেন। যেহেতু, শাক্যমুনি বুদ্ধদেব এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে যে স্তম্ভ রচনা করেন, তাহাতেও পূজ্যপাদ মহাস্থবির যে এইখানে জন্মিয়াছিলেন, এই কথাই লিখিত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যায়িকার সহিত শিলালিপি-বর্ণিত ঘটনার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য

বহু কাল্পনিক ঘটনা-পূর্ণ দিব্যাবদান পুস্তকের আংশিক ঐতিহাসিকতার সমর্থন করিতেছে।

অশোকের এই তীর্থভ্রমণ-কাহিনীর বর্ণনামতে উপগুপ্ত মহারাজ প্রিয়দর্শীকে বুদ্ধ ও তৎশিষ্যগণের বাসনিবন্ধন পবিত্র সকল স্থানগুলিই প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। অবদান-মতে উপগুপ্ত বৌদ্ধ শিষ্য মোগল্লির (মৌদ্গল্যায়নের) স্তূপটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, এইখানেই মোগল্লির দেহাবশেষ অবস্থিত। তিনি নিজ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শক্রের (ইন্দ্রের) রাজপুরী বৈজয়ন্ত প্রকম্পিত করিতে পারিতেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নন্দ ও উপনন্দ নামক নাগরাজদ্বয় তৎকর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েন। যে সর্পদিগকে বশীভূত করা এত দুরূহ, তিনি তাহাদিগকেও আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কোলিতক (মৌদ্গল্যায়ন) পূর্ণতাপ্রাপ্ত বুদ্ধি ও ক্ষমতায় এ জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে। উপগুপ্তপ্রমুখাৎ এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট্ প্রিয়দর্শী জরা, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্টের বহির্ভূত মোগল্লি মুনির যথাবিহিত স্তুতি-অর্চনা করিয়া তাঁহার স্তূপের জন্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।

মোগল্লির ন্যায় উপগুপ্তও দৈবক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করায় ইঁহাদের উভয়ের স্মৃতি কোনও কোনও স্থলে একত্র বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে মোগল্লিপুত্র তিখ্য অশোকের উপদেশকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা কেহ কেহ উপ-গুপ্তেরই নামান্তর বলিয়া মনে করেন।

উপগুপ্তের মৃত্যুসম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি মথুরা নগরীতেই দেহ রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার দেহাবশেষবিশিষ্ট কোনও স্তূপ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জাপানদেশীয় প্রবাদমতে একদা ভূকম্পনকালে তিনি (জীবনের) পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় বিশ্বাসমতে তিনি মহাকাশ্যপ ও কতিপয় অর্হতের ন্যায় পুনর্জন্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মানবদেহেই অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার 'সত্ত্ব' দেহকোষের মধ্যে অবস্থিত হইলেও তিনি 'অবিদ্যামুক্ত'। তাঁহার কর্ম্মসূত্রের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার দৈব ক্ষমতা ও বুদ্ধির দ্বারা তিনি অমরত্বলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

উপগুপ্ত এখন নাগলোকের রাজাদিগের ন্যায় সমুদ্রবাসী হইয়াছেন, ইহাই তাহা-দিগের ধারণা। এই বিশ্বাসের মূলে উপগুপ্তের সিন্ধুদেশে বাস, মথুরা হইতে জলপথে আগমন, নাগরাজগণকে বশীকরণ প্রভৃতি অবদান-বর্ণিত বৃত্তান্তগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে। মহারাজ অশোক পুনরায় নাগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ প্রবাদ যদি প্রচারিত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধসমাজে উপগুপ্তের সমুদ্রগর্ভে নাগলোকে বাস-বিষয়ক প্রবাদটিও সেরূপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না। ব্রহ্মবাসিগণ

মহাস্থবির উপগুপ্তের পুণ্যস্মৃতির অনেক দুর্গতি করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় উপগুপ্তের নাম 'উপগু'। তিব্বতীয়েরা যেরূপ বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রকে সারিছ বলিয়া থাকে, ইহাও সেই শ্রেণীর অপভ্রংশ শব্দ। উপগুপ্ত এখন জলদেবতা মাত্র। তিনি নাকি কৌতুক-প্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও স্নানার্থীর বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তাই পরবর্ত্তী বৌদ্ধ 'মৈত্রেয়ে'র আগমনকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ভাবেই থাকিতে হইবে। মৈত্রেয়ের আবির্ভাবের সহিত তিনিও জলকারা হইতে মুক্তি পাইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিবেন ও নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হইবেন। বর্ম্মিজদিগের বিশ্বাস, উপগুপ্ত সর্ব্বদা সমুদ্রমধ্যেই বাস করেন এবং মৌলমীনের অনতিদূরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রাসাদে তিনি তাঁহার "মার-বিজয়" স্মরণার্থ উৎসবাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশীয়েরা 'উপগু'র যে সকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে, তাহাতে তিনি পিত্তল-নির্ম্মিত ছাদের নিম্নে বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হইতে অন্ন গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপই চিত্রিত হইয়া থাকে। আবার তিনি বক্রভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া কোনও শবস্পর্শকলুষবিহীন স্থানের অনুসন্ধান করিতে-ছেন, এরূপ চিত্রও দেখা যায়। ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইলে, সুখদ আর্ত্তব পরিবর্ত্তনের কামনায় উপগুপ্ত-মূর্ত্তির শিরোদেশ জলে ডুবাইয়া এতদ্দেশীয় বৌদ্ধগণ তৎসমক্ষে নৈবে-দ্যাদি নিবেদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাসিগণ উপগুপ্তের সম্মানার্থে যে উৎসব অনুষ্ঠান করে, সেরূপ উৎসব নাকি নাগরাজ মহাকালের সংবর্দ্ধনার্থ ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে অদ্যাপিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* বর্ষাশেষে কার্ত্তিক মাসই এ পর্ব্বের অনুষ্ঠান-সময়। আমাদিগের 'দীপাবলী' (দেওয়ালী) পর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মবাসীরাও এই সময়ে প্রতিগৃহ দীপমালায় আলোকিত করিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পুষ্পাদিতে সজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত জলে ভাসাইয়া দেয়। ভাসাইবার সময় প্রার্থনা করে, নৌকাগুলি যেন উপগুর নিকটে পঁহুছিয়া সেই সৌভাগ্য-প্রদ দেবতাটিকে তাহাদের নিকটে আনয়ন করে। নিম্নব্রহ্মেও উপগুপ্ত সুপরিচিত। এই প্রদেশের অন্তর্গত 'ডেনাসেরিম' জেলায় ডিসেম্বর মাসে উপগুপ্ত-সংক্রান্ত আলোক-উৎসব হইয়া থাকে। উপগুপ্ত যে বিখ্যাত অর্হৎ ছিলেন এবং দৈববলে যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এ কথা অবশ্য সুশিক্ষিত বর্ম্মিজদিগের অবিদিত নহে। ডাঃ ওয়াডেলের মতে উপগুর জন্য নদীতে এই ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইবার প্রথা—স্থবির উপগুপ্তকে মথুরা হইতে আনয়নের জন্য নৌকা-প্রেরণের অস্পষ্ট স্মৃতি বহন করিয়া আনিতেছে। অশোক দেশ-বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশককে পারলৌকিক সম্পদের জন্য আনিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহাকে শুধু ঐহিক সম্পদের জন্য আনিতে চায়। যখন অনেকগুলি এই সকল ক্ষুদ্র দীপবাহী তরণী নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, সে দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোহর। শ্রীযুক্ত ওয়াডেল

* অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, বঙ্গদেশে ইহা প্রচলিত থাকার বিষয় আমরা অবগত নহি।

সাহেবের বর্ণনা আমাদিগকে মুসলমান পীর খাজা খিজিরের সম্মানার্থ অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদের 'ব্যারা' পর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদ-কাহিনী পৃঃ ৫৪১—৫৪৩ দ্রষ্টব্য)। কদলীকাণ্ড-নির্ম্মিত "ব্যারা" কয়টি ছাড়িবার পূর্ব্বে যখন পুরবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপবাহী "কমল"গুলি নদীর স্রোতে ছাড়িয়া দেয়, সে দৃশ্যও অতি মনোরম। যে দেখিয়াছে, সে সহজে বিস্মৃত হইবে না। যাউক সে কথা। 'উপগু'র দর্শন-লাভ করিলে লোকে দীর্ঘজীবন ও সুখসম্পদ্ লাভ করে, এই বিশ্বাস হেতু তাঁহার কল্পিত আগমন প্রচারোদ্দেশ্যে অনেকে গুপ্তভাবে নিজ দ্বারদেশে জলসিঞ্চন করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, জলদেবতা দুয়ারে জলের চিহ্ন না দেখিয়া আসিবেন কি করিয়া।

কালের কুটিল গতিতে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না সংসাধিত হইয়া থাকে। মহারাজ প্রিয়দশার ধর্ম্মোপদেশক প্রধান স্থবির যে ব্রহ্মদেশে জলদেবতায় পরিণত হইবেন, ইহা তাঁহার সমসাময়িকগণের কল্পনারও অগোচর ছিল সন্দেহ নাই।

[এই প্রবন্ধটি প্রধানতঃ J. A. S. B, Vol Lxvi P 76 Dr, L. A, Waddell প্রণীত "উপগুপ্ত" নামক প্রবন্ধ। 3 Bull ti ı L'Ecole Francaise d' Extreme Orient Tome IV. 1904 অন্তর্গত Upagutta at ma'ra নামক সন্দর্ভ অবলম্বনে লিখিত।]

শ্রীগুরুদাস সরকার।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে নারী-চরিত্র

"পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য

"অবকাশ-রঞ্জিনীর" পর নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য রচনা করেন। ভগবান্ নবীনচন্দ্রের নির্ম্মলানন্দ-কিরণালোকিত সরস হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্ব-বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া "অবকাশ-রঞ্জিনী" কাব্যে সুরঞ্জিত, বৈচিত্র্যময় ও নয়নাভিরাম-পল্লব-পরিশোভিত বিবিধ সুচারু বিটপিবিভূষিত কুঞ্জকাননে পরিণত হইয়াছে। উহা সন্দর্শনে ভাবুকের মনে বিবিধ মনোরম ভাবের ও নির্ম্মলানন্দের উদ্রেক হয়। উক্ত কবিত্ব-কানন 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে চির-সুবাসিত ও মধুময় কুসুম-সমলঙ্কৃত হইয়াছে। উক্ত কুসুমাবলীর অনুপম সৌন্দর্য্য পাঠকের মন মুগ্ধ করে ও উহাদের সুসৌরভ পাঠকের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। ভাবুকের মনোমধুকর উক্ত কুসুমাবলীর মধুপান করিয়া মুগ্ধ হয়। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের নারী-চরিত্র সমূহও এক একটি চিরসুবাসিত ও অনুপম সৌন্দর্য্যপূর্ণ কুসুম সদৃশ। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে তিনটি নারী-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উক্ত নারীত্রয় রাণী ভবানী, ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মী ও সিরাজমহিষী। আমরা নিম্নে ক্রমান্বয়ে উক্ত রমণীত্রয়ের চরিত্র-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী সহৃদয়া, দেশহিতৈষিণী, তেজস্বিনী, স্পষ্টবাদিনী ও দূরদর্শিনী। নবীনচন্দ্র রাণী ভবানীর যে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১

একটি রমণী-মূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘগ্রীবা, আকর্ণ নয়ন—
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান গর্ব্বিত বদন,
আবার পলকে সেই নয়ন-যুগল
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময়,
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা-গরল
আবার দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।

বিশ্বব্যাপী সেই দয়া জাহ্নবী যেমন
সমস্ত বক্ষেতে করে সুধা বরিষণ।
সুস্নিগ্ধ নয়নে ওই গম্ভীর বদনে
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন
ভাবিছে জানকী যেন অশোক-কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা বিষাদিত মন।

রাণী ভবানী অতি সহৃদয়া ছিলেন। স্বদেশের নিতান্ত শোচনীয় দশা অবলোকনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেই সময় দেশের অবস্থা যে কিরূপ ভয়ানক শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিন্তু তাহা ভাবি মনে এ শরণ যায়
কেমনে থাকিব বল? দিবস-যামিনী
থাকি সশঙ্কিত ধন-প্রাণ আশঙ্কায়,
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটে নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে
স্বীয় পদ-শব্দে যথা হয় সন্ত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবন-সঞ্চারে
ভাবি শমনের ডাক হই রোমাঞ্চিত।
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতু-গৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার?

সহৃদয়া রাণী ভবানী দেশের উক্তরূপ শোচনীয় দশা অবলোকনে নিতান্ত দুঃখ-পূর্ণ হৃদয়ে—

রে বিধাতঃ, কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ,
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ।.

রাণী ভবানী দূরদর্শিনী। তাঁহার দৃষ্টি কেবল বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধা নহে, উহা ভবিষ্যতের তিমিরপূর্ণ গর্ভেও প্রসারিতা। যে সিরাজদ্দৌল্লা বঙ্গের অসহনীয় দুঃখের নিদান, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেই যে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তিনি ইহা মনে করেন নাই। যাহাতে বঙ্গবাসীদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় পুনরায় পতিত হইতে না হয়, তাহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা ছিল। তিনি ভাবিলেন যে, সিরাজদ্দৌল্লার পর যিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, তিনিও হয় ত তদ্রূপ বা ততোধিক অত্যাচারী হইতে পারেন। তাই তিনি বলিলেন,—

—ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি ততোধিক হন অত্যাচারী,
ইংরেজ সহায় তার কি করিবে তবে ?

সেনাপতির সম্মুখে এরূপ কথা বলা রাণী ভবানীর নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচায়ক বটে।

মহারাজ রাজবল্লভ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ মত ছিল যে, নবাগত ইংরেজের সহায়তায় সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করা কর্ত্তব্য। তাই মহারাজ রাজবল্লভ বলিলেন,—

চিন্ত সদুপায়, মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও উক্তরূপ মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাণী ভবানী বলিলেন যে, যদি ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে ইংরেজ জাতিই ক্রমশঃ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু ইংরেজগণ দূরদেশবাসী, নবাগত ও অপরিচিত; তাঁহাদের শাসন কিরূপ হইবে, তাহা তৎসময়ে অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত, তাই তিনি বলিলেন,—

অন্তরে ইংরেজেরা নব্য পরিচিত
ইহাদের রীতি-নীতি আচার-বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি; না জানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি দূর সমুদ্রের পার।

অতএব ইংরেজের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে তিনি মত দিলেন না। তিনি সিরাজদ্দৌল্লার অত্যাচারে দেশের শোচনীয় অবস্থা এবং ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সময় হিন্দুজাতির স্বাধীনতা পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান জাতির অধঃপতন ও মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুত্থান অবলোকন করিয়া হিন্দু স্বাধীনতার পুনরভ্যুদয় সম্বন্ধে মনে উজ্জ্বল আশা পোষণ করিতেন, তাই তিনি বলিলেন,—

যেইরূপ যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন, অদৃষ্টে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট-যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত।

দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্রপতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছু দিনে আর
মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত-ভূপতি,
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার,
সার্দ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।

সুতরাং তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিলেন।

রাণীর কি মত ? শুন আমার কি মত,
ইন্দ্রিয়লালসামত্ত সিরাজদ্দৌলার
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত।

কিন্তু তিনি আত্মনির্ভরশালিনী। অপরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌল্লাকে রাজ্যচ্যুত করা তাঁহার মত নয়, তাই তিনি বলিলেন,—

—ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি ততোধিক হন অত্যাচারী,
ইংরেজ সহায় তার কি করিবে তবে ?

অতএব তাঁহার মতে,

অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ-রণে, যেন পূর্ণশশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ—

তিনি কেবল অপরকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন না, তিনি নিজেও যুদ্ধাভিলাষিণী, তাই তিনি বলিলেন,—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর-ভিতরে।

ইহা তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা ও দেশহিতৈষিতার পরিচায়ক বটে। তিনি অতি দূরদর্শিনী। তিনি দিব্যচক্ষে দর্শন করিলেন যে,যদি ইংরেজের সাহায্যে সিরাজদ্দৌল্লাকে

সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে নবাগত পরাক্রমশালী ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইবেন ; অতএব তিনি বলিলেন,—

১

মহারাজ একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন ;
মোগল-গৌরব-রবি আরঙ্গজীব সনে
অস্তমিত, নহে দূর দিল্লীর পতন।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বিক্রম
হতবল মহাবল ক্লাইবের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা ব্রিটিশ কেতন
উঠিছে ফরাসী দুর্গে হাসিয়া অম্বরে,
ক্ষুব্ধ সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতিবরে
আক্রমিবে কোন মতে বসিয়া বিবরে,

২

চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ,
তাহারা তোমরা যদি সহ সেনাপতি
বর তারে, তবে তার প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত, যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে ; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবারে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে, না পারিবে এই ভীমানল
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

৩

বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা, সমস্ত ভারত
ব্রিটিশের তেজোরশ্মি বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর,
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত।

দস্যু-ব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার
ব্রিটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ-সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হতবল ভানুর কিরণে।

রাণী ভবানীর সময়ে ইংরেজগণ এ দেশে নবাগত, বিশেষতঃ তিনি অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণী; সুতরাং তিনি ইংরেজগণের রীতি, নীতি, আচার, বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন না। অতএব তিনি ইংরেজগণের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করত সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ ভবিষ্যদুক্তিও করিলেন যে, ইংরেজ জাতি যেরূপ পরাক্রম-শালী ও রণদক্ষ, তাহাতে যদি তাঁহাদের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইবেন।

রাণী ভবানীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। ইংরেজ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। ভারতাকাশে ব্রিটিশ-ভানু উদিত হইয়াছে। ভগবান্ ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন করিয়া ভারতবাসীর মঙ্গলসাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্বাধীনে ভারতবাসীর শরীর ও সম্পত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর নিরাপদ্ হইয়াছে। ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। উদার-হৃদয়, ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী ইংরেজ রাজপুরুষগণের শাসনাধীনে ভারতবাসী ক্রমশঃ উচ্চশিক্ষা ও উচ্চপদ লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের উচ্চাভিলাষ ক্রমশঃ পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহারা ইংরেজ-রাজত্বাধীনে ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসনলাভের আশায় অনুপ্রাণিত হইতে-ছেন। এই বহু বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট জাতি-পরিপূর্ণ ভারত-বর্ষে ইংরেজরাজত্বাধীনে ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসনলাভই যে ভারতবাসীর বিশেষ মঙ্গল-জনক, তাহা সুধী ও চিন্তাশীল দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ মনে করেন এবং তাঁহারা ইংরেজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করেন।

শ্রীবগলামোহন দাশ গুপ্ত।

বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিধ্বনি কি প্রতিবাদ ?

আজকাল কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিবেকানন্দের মধ্যে যে সমস্ত originalityর আরোপ করিয়া তাঁহাকে নব্য বাঙ্গলায় Hero করিয়া তোলা হইয়াছে, উহা সমস্তই ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে বিবেকানন্দ পাইয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্য বা উক্তির মধ্যে যদি ধর্ম্মসমন্বয়ের বা সামাজিক আবর্জ্জনা পরিহারের চেষ্টা থাকে, তবে তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের অনুবর্ত্তন বা প্রতিধ্বনি মাত্র।

অতীতের কথা না হয় নাই তুলিলাম। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন খৃষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা মরু-মরীচিকার সম্মোহিনী শক্তি লইয়া বাঙ্গালীর মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে সুরঞ্জিত রামধনুর ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়াছিল, পরাধীন বিজিত জাতির জীবনে সে এক সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্ত, আর এই সঙ্কটের দিনে রামমোহন হিন্দুর শাস্ত্র ও সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য আদর্শকে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং বেদান্তের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের ঝড় বাঙ্গালী-সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও সমাজের উত্থান ও পতন, রাজনারায়ণ, অক্ষয়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম প্রভৃতি মনীষিগণের চিন্তাপ্রবাহ যুগপৎ বাঙ্গালী জীবন বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার এই সংস্কার-যুগের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিনি নিয়মিত উপাসনায় যোগদান করিতেন, ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতেন, এবং মাঝে মাঝে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ কি ১৯ বৎসর মাত্র। এই সময়ে সহসা একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল! ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের বালক শ্রীনরেন্দ্রনাথ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে জগতের সম্মুখে এক নব যুগধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন ও উক্তির মধ্যে আমরা যে আদর্শের ইঙ্গিত পাইয়াছি,তাহা রামমোহন এবং ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের অনুবর্ত্তন বা প্রতিধ্বনি কিংবা প্রতিবাদ, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে তাহারই একটু আলোচনা করিতে চাই।

সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া রামমোহনকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার মত অলোকসামান্য প্রতিভা তাঁহার ছিল, আর ছিল তাঁহার উদার হৃদয়। তিনি ধ্বংসনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। গড়িয়া তুলিবার উদ্ভাবনী শক্তি লইয়াই তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, স্বামীজী এই কারণে তাঁহাকে পরবর্ত্তী সংস্কারকগণের সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া কখনও ভাবেন নাই; বরং আলোচনাকালে অনেক স্থলে রাজার প্রতি স্বীয় অকপট শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রামমোহনকে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। স্বামীজীর মতে রামমোহন এতদ্দেশে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে সম্মতি ও সাহায্য প্রদান করিয়া এক মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন; যাহার ফলে জাতীয় উন্নতি পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসর বলিতে তিনি সংস্কার-যুগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, কে বলিবে?

বঙ্গদেশে রামমোহন হইতেই বেদান্তালোচনার সূত্রপাত হয়, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আংশিক ভাবে এবং বিবেকানন্দ পূর্ণ-ভাবে বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করিয়া রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তাবলম্বনে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে তিনি নৈতিক জীবনের উপযোগী কোন আদর্শ দেখিতে পান নাই বলিয়াই খৃষ্টধর্ম্মের নীতিবাদকে ব্রহ্মোপাসনার সহিত একত্র মিলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, এতদ্দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনে রাজার আগ্রহও উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম মুখ্য কারণ। অদ্বৈতবেদান্ত অবলম্বন করিলে নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িবে বলিয়া রামমোহনের আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন,আমরা তাহাতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অপরদিকে বিবেকানন্দ একমাত্র অদ্বৈতবাদকেই সর্ব্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূল-ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্যান্যবাদ ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইতে হইবে, তাহার কোন স্পষ্ট হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না। সেই জন্যই তিনি মুখ্যভাবে অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার করিয়াছেন এবং উহা মানবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া বর্ত্তমান বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে ইহা দৃঢ়তার সহিত সমর্থন ও পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়াছেন।এইখানেই বিবেকানন্দের প্রতিভা রামমোহনের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া এক উন্নততর, প্রশস্ততর, মৌলিক পথে প্রস্থান করিয়াছে, যাহা রামমোহনের প্রতিবাদ—তীব্র প্রতিবাদ। অন্যান্য সংস্কারকগণের তো কথাই নাই, রামমোহন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যের মধ্যে নিজেকে যতটুকু হারাইয়াছেন, বিবেকানন্দ উজ্জ্বল অঙ্গুলী দিয়া পরোক্ষভাবে তাহা দেখাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

রাজার মৃত্যুর দশ বৎসর পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রণয়ন ও প্রচার করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম রামমোহনের ঈপ্সিতপথে বিকসিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যাহা হউক, এই নবধর্ম শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে তৎকালে কম আলোড়িত করে নাই। তার পর ১৮৪৩ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন্মৃত ব্রাহ্ম-সমাজ তাহার উচ্ছৃঙ্খল অভিনয় পরিসমাপ্ত করিয়াছে। শতাব্দীব্যাপী এই উদ্বেল সংস্কার-স্রোতে অনেকগুলি তরঙ্গের উত্থান ও পতন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে যে যে শক্তিশালী পুরুষ সংস্কার-রথের রশ্মিধারণ করিয়া তাহাকে বিজাতীয় পথে চালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মী ও ভক্তচূড়ামণি কেশব যে দিন গর্ব্ব-সমুদ্ধত শির অবনমিত করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের পদতলে উপবেশন করিলেন, সেই দিন হইতেই সংস্কার-যুগের অবসান ও প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগের আরম্ভ। এই সমন্বয়-যুগের প্রধান ও প্রথম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা বলিলে যে কেবল তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, তাহা নহে; পরন্তু অশিষ্ট অজ্ঞতা ও স্পর্দ্ধিত ধৃষ্টতা যুগপৎ অতি অসংযতভাবেই প্রকট হইয়া পড়ে।

রামমোহন কোরাণ, বাইবেল ও উপনিষদ্ মিলিত করিয়া ধর্ম্মের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন - তাহা তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক হইতে পারে, অধিকারিবিশেষের অবলম্বনীয়ও হইতে পারে, কিন্তু তথাপি উহা সমীকরণ (Equation) সমন্বয় (Synthisis) নহে। দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রণয়নে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐরূপ সমীকরণকেই অবলম্বন করিয়াছেন বা অনুকরণ করিয়াছেন। তার পর খৃষ্টভক্ত কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সমন্বয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আদর্শ-জীবন চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও উহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই; অথবা ভুল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিংবা আংশিক ভাবে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। সেই কারণেই ধর্ম্মসমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি যে নববিধান ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সকল দিক্ হইতেই ব্যর্থ হইয়াছে। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার ও বর্জ্জন করিয়া নানাধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত কতকগুলি মত বা প্রণালী আহরণ করার নাম যে সমন্বয় নহে, আধুনিক যুগের যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন—অন্ততঃ করা উচিত।

অবশ্য, পাশ্চাত্য হইতে আমাদেব কিছুই গ্রহণ করিতে হইবে না অথবা গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই, এ কথা বলিলে মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতা এবং খৃষ্টধর্ম্ম যখন আমাদের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তখনও তাহাকে বর্জ্জন বা পরিহারের সামর্থ্য আমাদের ছিল না -এখনও নাই। নাই, কেন না, উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই এই নবাগতকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এ সমস্যা প্রত্যেক

মনীষীকেই চিহ্নিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, "অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রাজা রামমোহন রায়।" স্বামী বিবেকানন্দকেও এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।

রামমোহনের সময় পাশ্চাত্য-সমস্যা, সামাজিক-সমস্যা যে ভাবে ছিল—মহর্ষির সময় তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন রামমোহনের বড় সাধের ইংরেজী শিক্ষার কল্পবৃক্ষে বিষফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ডিরোজিওর স্বাধীনচিন্তাবাদী শিষ্যগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচার, ডফ্, ডিএল্‌ট্রীর খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের অক্লান্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে মহর্ষি, রাজনারায়ণ ও অক্ষয়কে, দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বলিবে, সামাজিক অবস্থাবিপর্য্যয় হেতু মহর্ষি বাধ্য হইয়াই রামমোহনের আদর্শ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন কি না? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া লইবার জন্য মহর্ষি যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, যে সাধনা অবলম্বন করিয়াছিলেন,—হয় তো কালে তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিত, অথবা কি হইত, কে জানে? কিন্তু গভীর ক্ষোভের বিষয়, মহর্ষির মানসপুত্র ও শিষ্য কেশব যে দিন তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এক অভিনব পথে যাইবার জন্য স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইলেন—সেই দিন হইতে সংস্কারযুগ আত্মদৌর্ব্বল্য অসংযতভাবে প্রকট করিয়া যে ভাবে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অন্ধ অনুকরণ,—অবিবেকী ব্যভিচার,—নির্ল্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তি;—সমন্বয় নহে।

অবশ্য, এই অনুকরণমোহ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অল্পাধিকরূপে মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় বিজয়ী জাতির গৌরবচ্ছটার রক্তাক্ত আলোক লক্ষ্য করিয়া আত্মঘাতী অভিসারে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মকে কলুষিত করিয়া, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে অন্ধের মত পরিহার করিয়া, অতীত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া—১৮৬৬ সালের ব্রাহ্ম-সমাজ যে কি সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষায় হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের অঙ্গে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল, আজ সেই নির্ব্বাপিত অগ্নির পরিত্যক্ত ভস্মরাশির মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। রামমোহনের সময় হইতে বাঙ্গালীর ধর্ম্মচিন্তা ও সমাজ-সংস্কার-নীতি কত বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, কত লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর লজ্জারই হউক আর গৌরবেরই হউক—ইতিহাস! এই ইতিহাস রামমোহনের পর আর কেহ সমন্বয়ের বার্ত্তা লইয়া সংস্কার-সভা-সমূহের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, এমন সাক্ষ্য প্রদান করে না। শতাব্দীর আলোচনায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গলা দেশে রামমোহনের পর বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

"অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

অন্যান্য গুরুতর কারণের সহিত এই কারণেও বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিতে হইয়াছিল। উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের অনুকরণ বলিয়া ভ্রম হইলেও, প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই জানিতে পারিবেন যে, স্বামীজী কোন ক্রমেই রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের প্রতিধ্বনি নহেন। রামমোহনের বিলাত-গমনের চল্লিশ বৎসর পর কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং তাহার বাইশ বৎসর পর পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৩০, ১৮৭১, ১৮৯৩, এই সমস্ত বিভিন্ন স্মরণীয় তারিখগুলির মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন জনের কার্য্যপ্রণালী বিচার করিলে দেখা যাইবে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণ করা দূরে থাক্ বরং তাহার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যাহাকে প্রতিবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষভাবেই সচেতন থাকে, সে হিসাবে ব্রাহ্মযুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন; এবং তাহা ছিলেন বলিয়াই একদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিবাদ যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি যে কঠোর সাধনে ব্রতী হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে কথা বিস্মৃত হইলেও চলিবে না। আবার দেখিতে হইবে যে, রাজনারায়ণ, ভূদেব ও বঙ্কিমের চিন্তাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। আমরা যে সমস্ত মনীষীর নামোল্লেখ করিলাম, আলোচনা করিলে দেখা যায়, একের উপর অন্যের প্রভাব অনিবার্য্যরূপে কিছু না কিছু আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইঁহাদের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্ধ ব্যতীত কে অস্বীকার করিবে? সংস্কারযুগের প্রভাব বিবেকানন্দের মধ্যে থাকিলেও (যাহা থাকাই স্বাভাবিক) সকল দিক্ হইতেই তাঁহার মৌলিকত্ব ও ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এক অতি অনুপম ভাস্বরদীপ্তিতে ইতিহাস আলোকিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামী সংস্কার-যুগকে গ্রাস করিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক পরবর্ত্তী যুগপ্রবর্ত্তককেই তাহা করিতে হয়।

সমন্বয়ের আদর্শ বিবেকানন্দ কোথায় পাইয়াছিলেন?—বোধ হয়, বাঙ্গলাদেশের বালকও কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সংকীর্ত্তনামৃত

উপরে যে বইখানির নাম করা হইল, ইহা একখানি পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সংপ্রতি অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব এই অমূল্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সংকলক দীনবন্ধু দাস। এ পর্য্যন্ত যে সকল পদকর্ত্তা বা সংগ্রহকারের নাম জানিতে পারা গিয়াছে, তন্মধ্যে দীনবন্ধু দাসের নাম পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র "পদরসসার" গ্রন্থে উক্ত কবির রচিত দুইটি পদ কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ, মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে অন্যান্য পদকর্ত্তা অপেক্ষা সংকলক দীনবন্ধু দাসের রচিত পদসংখ্যাই অধিক; তাঁহার রচিত ২০৭টি পদ এই পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির আকার ১২৮×৪॥, পত্রসংখ্যা ১২৭, সম্পূর্ণ; লিপিকাল ১৬৯৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। বানান অতি বিশুদ্ধ, এমন কি, বাঙ্গলা পুঁথির বানানে এমন বিশুদ্ধতা আমরা খুব অল্পই দেখিয়াছি। পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ডে পুঁথিখানি বিভক্ত; পূর্ব্বখণ্ডে ১৫ এবং উত্তরখণ্ডে ৫, মোট ২০টি অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের পর, সেই খণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের একটি সূচীপত্র পদ্যে লিখিত আছে। লেখকের নামধাম ও "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" প্রভৃতি যে সকল বাঁধা গদ অপরাপর পুঁথিতে প্রায়ই দেখা যায়, আলোচ্য পুঁথিতে তাহা নাই। কেবল অধ্যায়-শেষে "শকাব্দা ১৬৯৩ মাহ বৈশাখ ৫ রোজ, সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।" এইমাত্র লেখা আছে। গ্রন্থমধ্যে পঁয়ত্রিশ জন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে; তাঁহাদের নাম এই,—১ নরোত্তম দাস, ২ লোচন দাস, ৩ কুমুদানন্দ, ৪ যদুনাথ দাস, ৫ শ্যাম দাস, ৬ ঘনশ্যাম দাস, ৭ রামানন্দ বসু, ৮ প্রেমদাস, ৯ বংশীবদন, ১০ জয়দেব, ১১ নরসিংহ, ১২ ভূপতিনাথ, ১৩ মুকুন্দদাস, ১৪ চম্পতিনাথ, ১৫ যাদবেন্দ্র, ১৬ নন্দকিশোর, ১৭ বিপ্রদাস ঘোষ, ১৮ অনন্ত, ১৯ বলরাম দাস, ২০ দিব্যসিংহ, ২১ বল্লভ দাস, ২২ গিরিধর দাস, ২৩ মথুরেশ দাস, ২৪ নরহরি, ২৫ কবিশেখর, ২৬ চন্দ্রশেখর, ২৭ সনাতন, ২৮ গোবিন্দ দাস, ২৯ জ্ঞানদাস, ৩০ কবিরঞ্জন, ৩১ বিদ্যাপতি, ৩২ নয়নানন্দ, ৩৩ লোচনানন্দ, ৩৪ বাসুদেব ঘোষ, ৩৫ দীনবন্ধু দাস। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডিদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জায় সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে চণ্ডিদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটি পদে তাহার সুর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।

পদকর্ত্তা ও সংগ্রহকার দীনবন্ধু দাস বাঙ্গলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই যে বিশেষ

ব্যুৎপন্ন ছিলেন, আলোচ্যগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রথমেই তাঁহার নিজকৃত চারিটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতং পাদপদ্মং বন্দে মুহুর্ম্মুহুঃ।
যৎকৃপাগন্ধমাত্রেণ কৃতার্থা নর-ষট্‌পদাঃ॥
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দযুগলং নত্বা তদীয়ানহং
বন্দে পাদরজঃ শিরস্যনুবহন্ ত্যক্ত্বা ভয়ং কালতঃ।
বন্ধুনামুপরোধভাগ্যবশতঃ প্রাচীনপদ্যাবলী
যত্নেন গ্রথিতা ময়া ক্রমকৃতা সৎকণ্ঠহারাবলী॥
রাধাকৃষ্ণ-রসোদ্রেকং বর্ণিতং পদকারকৈঃ।
কিঞ্চিদ্‌যথাক্রমং কৃত্বা লিখিতং দীনবন্ধুনা॥
গুণজ্ঞা গীয়তাং নিত্যং চিন্ত্যতাং ভাবুকা জনাঃ।
রসজ্ঞাঃ শ্রূয়তাং রাধা-কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনামৃতম্॥

মাত্র এই কয়টি শ্লোকেই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না, পুঁথির মধ্যে কয়েকটি সুলিখিত সংস্কৃত পদও তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানে আমরা তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত পদ উদ্ধৃত করিলাম।—

পুরবী

জননি দেহি নবনীতম্।
জঠরানল উপ- দহতি কলেবর-
মনুপালয় সুতগীতম্॥
মম নীরস-মুখ- মচিরমপাকুরু
দধি বিতরয় নিজ ডিম্ভে।*
চলয়তি মৃদু-পব- নোঽপি তনুং মম
ভোজন-সময়-বিলম্বে॥
দশন-বসন-রস- নে নচ রস ইহ
জীবয় নিজ-পরিবারম্।
সুতমপি তব লঘু- মপি মনুষে কিল
ধনমতি গুরু দধিসারম্॥

---

* ডিম্ভ—শিশু।

অ(য়ে কঠিনে মরি করুণালবমপি
নহি কুরুষে যদি তোকে।*
সহচর দীন- বন্ধুরপযশ ইতি
সদসি বদিষ্যতি লোকে॥ ১২॥

ইহা ছাড়া উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, চৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার যেরূপ সুললিত পদ্য অনুবাদ তিনি আলোচ্য গ্রন্থের বহুস্থলে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে দীনবন্ধু দাসের দুই রকম বাঙ্গলা পদ পাওয়া যায়। প্রথম প্রাচীন পদাবলীর বাঙ্গলা, দ্বিতীয় আজকালকার সময়ের সুললিত সহজ বাঙ্গলা। দুই রকম বাঙ্গলা পদ-রচনায়ই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা যখন প্রচলিত ছিল, তিনি সেই সময়কার লোক না হইলেও, তাঁহার রচিত প্রাচীন বাঙ্গলার পদ যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমাদের মনে হয়, যেন ইহা সেই যুগেরই এক জন কবির রচিত। পক্ষান্তরে, তিনি আধুনিক সময়ের কবি না হইলেও তাঁহার সহজ বাঙ্গলার পদগুলি পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন ইহা আজকালকারই কোন কবি রচনা করিয়াছেন। এইরূপ উভয় প্রকার পদরচনায়ই তাঁহার নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু দাস প্রাচীন পদকর্ত্তাদের মধ্যে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যাঁহার সমকক্ষ, প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে তাঁহার স্থান যাঁহার পরে, কোথায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। আমরা মাত্র তাঁহার কয়েকটি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিব; পাঠকগণ তাহা দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিচার করিবেন। এই কয়টি পদ আমরা বাছিয়া বাছিয়া তুলিলাম না। ইহা অপেক্ষাও তাঁহার উৎকৃষ্ট পদ গ্রন্থমধ্যে আছে।

তথা রাগঃ

সুরজ আরাধন ছল করি সুন্দরি
নিধুবন করল পয়ান।
গোধন সঙ্গে রঙ্গে যমুনা-তটে
বিহরই নাগর কান॥
বিদগধ রসময় নাহ।
ভঙ্গ তরু চম্পক হেরি বেয়াকুল
বাঢ়ল বিরহক দাহ॥

* তোক—পুত্র।

ঝরঝর লোর ভোর দিঠি পঙ্কজ
সঘন মোছই পীতবাসে।
ছল করি সহচর সঙ্গতি পরিহরি
চলল রাই অভিলাষে॥
চৌদিকে চকিত রাই পথ নিরিখত
দিগ বিদিগ নাহিঁ জান।
দীনবন্ধু ভণ হৃদয় উচাটন
বিদগধ নাগর কাহ্নু॥

কামোদঃ॥ স্বয়ং দৌত্যং শ্রীকৃষ্ণস্থ॥

রাইক দরশ পরশ-রস-লালসে
বিদগধ নাগবরাজ।
পরিহরি মুরলি থুরলি অতি আকুল
আওল নিধুবন মাঝ॥
হরি হবি কি কহব মনমথ কাজ।
সঙ্কেত বিহনে গহনে পহুঁ ভবমই
জনু মাতল গজরাজ॥
সহচরি সঙ্গে রঙ্গে বর-নাগরি
জাহা গাথই ফুলদাম।
সেই নিকুঞ্জে আসি অতি হরষিত
বদরিকোরে রহু শ্যাম॥
দুবহিঁ নয়নে নয়নে দুহুঁ মীলল
উপজল প্রেম-তরঙ্গ।
দীনবন্ধু তথি করতহিঁ সঙ্গতি
কঠিন ঘটন নব সঙ্গ॥

শ্রীমতী যখন শ্রীকৃষ্ণকে—'তুহুঁ যদি মাধব করবি সুলেহ।
মদন সাখি করি খত লিখি দেহ॥"
বলিয়া অন্যান্য বহু সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, তখন কবি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলাইতেছেন,—

তথা রাগঃ

কত কত কোটি জনম করি জপ তপ
পাওলুঁ তুয়া নব লেহ।

যমুনা জল ফল তিল তুলসী-দল
দেই সমাপলুঁ দেহ ॥
সুন্দরি ধনি ধনি সাধু বিবাদ।
তুহু যদি নিজ কিং কর করি রাখবি
মাফ করবি অপরাধ ॥
নিতি নিতি রজনি দিবস মঝু মানস
গুণগণ গাওব তোর।
তুয়া মুখ হেরি কোন বর পামর
আন যুবতি করু কোর ॥
তুয়া পদ-পল্লব নখমণি কাগজ
দাস কবজ তহিঁ লেখি।
জীবনে মরণে তোহে তনু সোঁপলু
দীনবন্ধু রহু সাখি ॥

অথ নিবেদন

সুন্দরি কবহুঁ নিবেদন তোয়।
ও পদ-পঙ্কজে নিজ কিঙ্কর করি
অহনিশি রাখবি মোয় ॥
তুয়া অভিলাষে ভোরি তনু চর চর
আওলুঁ বিপিন কি অন্ত।
তরু তরু কুসুম হেরি মন বারণ
জারল বিরহ দুরন্ত ॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ দুখ দেওল
আওলুঁ কুঞ্জকুটীর।
হেরইতে রূপ মনোভব মঙ্গল
মঝু মন বান্ধল থীর ॥
তুয়া বিনে রজনী দিবস নাহি জানিএ
তুহুঁ মোর জীবন রাই।
দীনবন্ধু কহে শুন শুন সুন্দরি
তুয়া বিনে আর কেহো নাই ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য.

রসে চর চর বিনোদ নাগর
বসিঞা রাইএর কোরে।
মুখ নিরখিঞা উলসিত হঞা
ভাসিল নয়নজলে॥
হরি হরি এ কি অপরূপ ধন্দ।
রাই রাই করি কান্দিঞা আকুল
হইল গোকুলচন্দ্র॥
রাইর আচার ধরি গিরিধর
কান্দিতে কান্দিতে বলে।
রসবতি সনে আর কত দিনে
বিধি মিলাওব মোরে॥
পুলকিত তনু মলিন বদন
অঝরে নয়ন ঝরে।
পরাণ-পুতলী অধিক মুরলী
পড়িঞা রহিল দূরে॥
পিরিতি-পাগল রসিক নাগর
দেখিঞা আপন কোরে।
দীনবন্ধু ভণে রসবতি প্রেমে
ধৈরজ ধরিতে নারে।

দীনবন্ধু দাসের কয়েকটি পদে চণ্ডিদাসের সোজা বাঙ্গলা পদের অনুকরণচিহ্ন সুস্প দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ একটি পদ এখানে তুলিয়া দিলাম,—

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব তোরে,
এ তিন ভুবনে আর কেহ নাহি
দয়া না ছাড়িহ মোরে॥
জাতি কুল শীল ছাড়িঞা সকল
তোমার হইলাম আমি।
জনমে জনমে জীবন মরণে
প্রাণনাথ হয়্য তুমি॥

আমার পরাণে তোমার চরণে
একই করিঞা, বাসি।
নিশ্চএ জানিহ জনমের মত
হইলাম তোমার দাসী॥
শয়ন সপনে তোমা ধন বিনে
আর কিছু নাহি জানি।
অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি
দেখিলে এমতি মানি॥
মন সুত করি তোমা গুণনিধি
গলাএ গাথিঞা নিব।
দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে
আর কি ছাড়িঞা দিব॥

দীনবন্ধু দাস চণ্ডিদাসের পদের অনুকরণে উপরি-উক্ত পদ রচনা করিয়াছেন, না বর্ত্তমানে চণ্ডিদাসের ভণিতাযুক্ত যে সব সোজা বাঙ্গলা পদ পাওয়া যায়, দীনবন্ধু দাসের পরবর্ত্তী অপর কোন চণ্ডিদাস কর্ত্তৃক দীনবন্ধু দাসের অনুকরণে সেই সকল পদ রচিত হইয়াছে, তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। আমাদের মনে হয়, যদিও অনুকরণ-প্রিয়তা বাঙ্গালী কবিগণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তথাপি দীনবন্ধু দাসের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র এইরূপ দুই একটি পদসাদৃশ্য দেখিয়াই অনুকরণকারী বলিয়া স্থির করা উচিত নহে।

দীনবন্ধু দাস কোন্ সময়ের লোক, কোন্ জাতি এবং কোন্ সময়ে তিনি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, আলোচ্য পুঁথি হইতে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। তিনি কায়স্থ বা বৈদ্য-জাতীয় ছিলেন, দাস শব্দ দেখিয়া তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কেন না, চৈতন্যপন্থী অনেক ব্রাহ্মণ কবিও নিজেকে দাস শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে কবি যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রপিতামহের নাম শ্রীঠাকুর হরি, পিতামহের নাম নন্দকিশোর এবং পিতার নাম বল্লবীকান্ত। আরও জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা অনেকেই পদ এবং পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহারা ইতিহাস, পুরাণ, আগম অলঙ্কার, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি এবং বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি আলোচ্য গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে। এ স্থলে উহা উদ্ধৃত করিলাম।—

* কবির পিতামহ নন্দকিশোরের ছয়টি পদ আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রপিতামহের নাম শ্রীঠাকুর হরি। তার পদপদ্মধূলি নিজ শিরে ধরি॥
পিতামহ ঠাকুর নাম শ্রীনন্দকিশোর। তাহার করুণা বলে হেন ইৎসা মোর॥
পিতা শ্রীবল্লবীকান্ত ঠাকুরের দয়া। সেই বলে লিখি আমি ভক্তিশক্তি পাঞা॥
পূর্ব্বপ্রতি প্রতি পুরুষের যোগ্যতা অনন্ত। পাণ্ডিত্যে সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ॥
স্তবমালা স্তবাবলী বিদগ্ধমাধব। গোবিন্দলীলামৃত আর ললিতমাধব॥
বিল্বমঙ্গল কর্ণামৃত রসামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মসংহিতা ভাগবতামৃত নানা ছন্দ॥
সন্দর্ভ দশম টিপ্‌পনী আদি যত। ভক্তি-গ্রন্থ সংগ্রহ করিল শত শত॥
ইতিহাস পুরাণ আগম অলঙ্কার। নব্য প্রাচীন স্মৃতি সাহিত্য আপার॥
পদ পদাবলী কত করিল বর্ণন। প্রাচীন আনিঞা কত করিল লিখন॥
আমি অল্পজ্ঞানী গ্রন্থ বুঝিতে নাহি শক্তি। সৎসঙ্গ নাহিক তাথে নাহি জানি ভক্তি॥
যথা কথঞ্চিৎ গ্রন্থ করিঞা দর্শন। কিঞ্চিত লিখিল এই সংকীর্ত্তনক্রম॥

১২৭ সংখ্যক পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ২য় পৃষ্ঠায় দীনবন্ধু দাসের রচিত একটি পদ লিখিত আছে। তাহাতে জানা যায় যে, কবির ভ্রাতার নাম লোকনাথ এবং পুত্রের নাম গোলোক। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

দীননাথ বড় পতিত অধম আমি।
মনে মনে আস করাছি শ্রীবাস
পতিতপাবন তুমি॥
ভজন পূজন না জানি কখন
মগন অসত কাজে।
এবে আচম্বিতে ভব তরাইতে
ভার দিব কোন্ লাজে॥
* * * *
যবন আকুল ভাসে।
সুন্যাছি পুরাণে চাপিঞা বিমানে
তঁর্যা গেল অনায়াসে॥
দ্বিজ অজামিল * * পাপী ছিল
শুনিঞাছি ভাগবতে।
সেহো গেল তরি নারায়ণ বলি
ডাকিঞা আপন সুতে॥
ভাই লোকনাথ তনুজ গোলোক
কাজে ডাকি বারে বার।
দীনবন্ধু বলে এই নাম হলে
ভবনদী হব পার॥

পদাবলীর সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পদ-সমুদ্র; ইহার সংগ্রাহক আউল মনোহর দাস। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট মাত্র ইহার অস্তিত্বের সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্য কোথাও এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। কোন কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক উক্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আবার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের পরেই রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত "পদামৃত-সমুদ্র" এবং বৈষ্ণবদাসের "পদকল্পতরু"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় নিমানন্দ দাসের সঙ্কলিত "পদ-রসসার" নামক আর একখানি পদাবলীর বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। * এতদ্ভিন্ন পদকল্পলতিকা, গীত-চিন্তামণি, গীতরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয়, পদরত্নাকর, রসমঞ্জরী, লীলা-সমুদ্র, পদার্ণব-সারাবলী, গীতকল্পতরু প্রভৃতি আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে। আমাদের আলোচ্য "সংকীর্ত্তনামৃত" গ্রন্থখানি প্রথমোক্ত চারিখানি গ্রন্থের সহিত তুলিত হইবার উপযুক্ত না হইলেও, শেষে যে সকল গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, তদপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গলা দেশে ভাবের বন্যা ছুটিয়া, যে সকল ভক্ত কবির হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল, তাঁহাদের রচিত সমস্ত পদাবলীই উপরি-উক্ত গ্রন্থ সমূহে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমন কথা আমরা কখন ভাবি নাই। আমাদের বিশ্বাস, এখনও অনেক অজ্ঞাত ভক্ত কবির বহু অজ্ঞাত পদ পল্লীবাসীর নিভৃত কুটীরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। দিনের পর দিন যাইতেছে, আর তাহা অযত্নে ও কীটকুলের অত্যাচারে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হই তেছে। আমাদের এই কথা যে যথার্থ, আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকজন নূতন পদকর্ত্তার আবিষ্কারেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশের উপযুক্ত।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

---

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

একখানি প্রাচীন পুঁথি

সম্প্রতি "ত্রৈলোক্যপিরের পাঞ্চালী" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আমি পাইয়াছি। পুঁথিখানি হাতে লইয়া ভাবিয়াছিলাম, "ত্রৈলোক্যপির" সত্যপীর ও মাণিকপীরের সমজাতীয় কোন পল্লীদেবতা হইবেন। কিন্তু পরে পুঁথিখানি পড়িয়া দেখিলাম, শুধু তাহাই নহে; ইনি "মোচরা পীর" নামক অপর এক পীরের "জ্যেষ্ঠ ভাই", এ পরিচয় স্বয়ং মোচরা পীর সত্যপীরকে দিতেছেন। মোচরা পীরের নাম ইতিপূর্ব্বে আমি আর শুনি নাই।

এই সত্যপীর, মাণিকপীর, ত্রৈলোক্যপীর জাতীয় দেবতাগুলি যে হিন্দু-মুসলমান-ভক্তের ভাবসমন্বয়ে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নামের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সহজে বুঝা যায়। ইঁহারা এখনও নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমানের সমান শ্রদ্ধার পাত্র এবং ইঁহাদের পূজার উপকরণও অন্যান্য হিন্দুদেবদেবীর পূজার উপকরণ হইতে কতকটা পৃথক্। অধিকন্তু ইঁহাদের উপাসকেরা নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে "সিন্নি"ই প্রসাদ লইয়া থাকেন।

পীর-পূজার সহিত 'অসাধারণ' নবপূজাব 'কোন নিগূঢ় সম্পর্ক আছে কি না, জানি না। কিন্তু পীরের সিন্নি-সম্ভারের কথা ভাবিলে মনে হয়, ইঁহারা প্রধানতঃ দীনদুঃখীর উপযোগী দীনতারণ দেবতাই হইবেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর পীর দেবতার পূজামাহাত্ম্য প্রচার করেন, দীনদুঃখীর শক্তি-সম্বলের প্রতি যে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 'ত্রৈলোক্যপীরে'র অর্চ্চনায় "তিন করার খার" অর্থাৎ "তিন কড়ির গুড়" মাত্র আবশ্যক হইয়া থাকে। অথচ পূজকের লাভ প্রচুর—"বিপদ খণ্ডন তার বাড়ে ধন জন!"

সত্য সত্যই আমাদের পুণ্যভূমি বাঙ্গালার এমন একদিন ছিল, সেদিন ব্যয়বহুল পূজানুষ্ঠানে ধনিগৃহ যেমন সর্ব্বদা উৎসব-মুখরিত থাকিত, তেমনিধারা দরিদ্র কুটীর-গুলিও অনায়াসসাধ্য পূজা পার্ব্বণের আনন্দ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইত না। পক্ষান্তরে, হিন্দু মুসলমান উভয় ভ্রাতাই এ আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করিত। আমার বাঙ্গলামার সে অপূর্ব্ব আনন্দহাট সুখ-স্বপ্নের মত শুধু একটুকু মধুর স্মৃতি রাখিয়া আজ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, কে জানে?

যাহা হউক, "ত্রৈলোক্যপিরের পাঞ্চালী"খানি প্রাচীন তুলট-কাগজে লিখিত হইয়াছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ মাত্র। লেখকের নাম—"শ্রীঅধীলচন্দ্র শর্ম্মা।" তাঁহার কোন

পরিচয় নাই কিংবা গ্রন্থ-রচনার কোন সময়ের উল্লেখ নাই। এ দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করা এখন সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান সময়ে প্রতিভাশালী কবিগণ যেমন ছন্দঃ, মাত্রা প্রভৃতির নিগড় হইতে কাব্যলক্ষ্মীকে মুক্তি দিতেছেন, সে কালের কবিগণ তেমনি বর্ণবিন্যাসের হাঙ্গামা হইতে সচরাচর আপনাকে দূরে রাখিয়া চলিতেন। যে কোন প্রাচীন পুঁথি হাতে লইলে দেখা যায়, যখন যেমন কলমের মুখে আসিয়াছে, প্রায় স্থলে প্রাচীন কবিগণ তেমনি বর্ণ-বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন—'ই' 'ঈ' কিংবা 'শ' 'ষ' 'স' ইত্যাদি বিচার করিবার অবসর পান নাই। বর্ণবিন্যাসের এ নিরঙ্কুশ-গতি আলোচ্যমান "ত্রৈলোক্যপিরের পাঞ্চালী"তেও অপ্রতিহত রহিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পক্ষান্তরে, প্রাচীন পুঁথির বিশেষত্ব 'য়' ও 'য়া' স্থানে যথাক্রমে 'এ' 'অ' 'আ' এর ব্যবহার এই পাঞ্চালীখানিতে বিদ্যমান। কোন কোন স্থলে 'হয়েছে' বা 'হইয়াছে'কে 'হইঅছে' এবং 'হইয়ে' বা 'হইয়া'কে 'হইঅে' লিখিত হইয়াছে। হয় ত এক সময়ে এরূপভাবে বর্ণবিন্যাস শুদ্ধ ছিল।

"ত্রৈলোক্যপিরের পাঞ্চালী" খানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারম্ভে অন্যান্য প্রাচীন পুঁথির ন্যায় হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা না করিয়া প্রকৃতির বন্দনার ভিতর দিয়াই পুঁথি-খানা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে যে একটি ক্ষুদ্র 'লাচারি' ছন্দ আছে, তাহার দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষরের সহিত চতুর্থ পংক্তির শেষ অক্ষরের মিল নাই। এরূপ "অমিত্রাক্ষর লাচারি" কিংবা গ্রন্থারম্ভে প্রাকৃতিক বন্দনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

"পাঞ্চালী"-লেখক কবি শ্রীঅখীলচন্দ্র শর্ম্মার কবিত্বশক্তি "সোনার ঘোরা রূপার জিন" পর্য্যন্তই। এ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া পুঁথিখানি নিয়ে আদ্যন্ত যথাযথ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি; পাদটীকায় দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থও লিখিয়া দিলাম। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা পুঁথিখানির গুণাগুণ বিচার করিবেন। কিন্তু সাবধান!—

"পীরের পাঁচালী জেবা করে অবহেলা :
নীশ্চয় জানিঅ ভাই জমঘরে গেলা :"

সুতরাং নিবেদন ইতি।

শ্রীগুরবে নমঃ নমো গণেশায়ঃ

ত্রৈলোক্যপিরের পাঞ্চালী ঃ

পূর্ব্বদিগ বন্দিব আমি শ্রীভানু ভাস্কর ঃ
একদিগ উঠে ভানু চৌদিগে পসর ঃ (১)
উত্তরে বন্দিব আমি হিমালয় মহাজন ঃ
জাহার হিমানে (২) কাপে এই তিন ভুবন ঃ
দক্ষিনে বন্দিব আমি ক্ষিরনদি সাগর ঃ
জাহার প্রসাদে জিয়ে সাহু (৩) সদাগর ঃ
পশ্চিমে বন্দিব আমি গঙ্গা ভাগিরথি ঃ
জাহার কৃপাএ হয় বৈকুন্টেতে গতি ঃ
গনেশ দেবতা বন্দম গৌরির নন্দন ঃ
জেই পদ সেবিলে হয় বিঘ্ন বিনাসন্ ঃ
প্রনমোহ ভগবান দেব নারাঅন ঃ (৪)
দুক্ষ (৫) দারিদ্র খণ্ডে ভব পরিত্রান ঃ
দেবির চরন বন্দম জগতজননী ঃ
দেবগনে,রক্ষা কৈলা অসুরমর্দ্দিনী ঃ
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দম দেব দুইজন ঃ
উৎপত্তি প্রলয় হয় জাহার কারন ঃ
ঐরাবত পিষ্টে (৬) বন্দম সহস্রলোচন ঃ
প্রনমোহ ধর্ম্মরাজ মহিষ বাহন ঃ
সরেস্বতি দেবি বন্দম জ্ঞান-মুক্তিদাতা ঃ
সন্তি শাবিত্রি বন্দম গাইত্রি, (৭) বেদমাতা ঃ
শ্রীরাম লক্ষন বন্দম ভাই দুইজন ঃ
সমুদ্র বান্দিআ (৮) কৈলা রাবন নীধন ঃ
মাতৃ গুরু বন্দিব আর আর্চাজ্য (৯) মহাজন ঃ
আত্ত গুরু বন্দিব পিতৃ-মাতৃর চরন ঃ

---

(১) চট্টগ্রাম অঞ্চলে আলোকে "পহর" বলে। বোধ হয়, গ্রন্থকার এ স্থলে "হ" স্থানে "স" প্রয়োগে শুদ্ধ করিয়া 'পসর' লিখিয়াছেন। (২) হিমে, শীতে। (৩) সাধু—বণিক্। (৪) নারায়ণ। (৫) দুঃখ। (৬) পৃষ্ঠে। (৭) গায়ত্রী। (৮) বাঁধিয়া। (৯) আচার্য্য।

দেবমধ্যে বন্দিব জে প্রধান দেব শ্যাম :
নাগমধ্যে বন্দিব জে প্রভু গুনধাম :
বিদ্যাপতি কবির বন্দম পবিত্র কারন :
একে একে বন্দিবেক এ তিন ভুবন :
স্তুতি করি কহি শুন হইয়ে একমন :
কহিব পাঁচালী কিছু পিরের কারন :
একদিন সৈত্য (১০) পির পৃথিবিতে আসি :
দোকান করিআ বৈসে তির্থ বারানসি :
হেনকালে তথাতে আসিল মোচরা পির :
তামা হাতে করিআ জে আগে হইল স্থির :
সত্যে পীরে দেখীআ তারে আদর করিআ :
বসিতে আসন তারে দিলেক আনীআ :
মোচরা পীরে কহে কথা সত্যপীরে চাই : (১১)
ত্রৈলোক্যপীর আছে মোর জেষ্ট ভাই :
অনেক দিবসে আমি তাহান (১২) লাগ (১৩) পাইআ :
সেবা করিব আমি বহু দ্রর্ব্য দিআ :
এ সব শুনিআ পীর তথাতে আসিলেন :
মোচরা পীরের স্থানে কহিতে লাগিলেন :
নরলোক অল্পবুদ্ধি ধনের কাতর :
অল্প দ্রব্য দিআ ভক্তি করিব বিস্তর :
এ সব কথা জথ (১৪) কহিতে আছেন :
হেন কালে তথাত আইল সাধু একজন :
ঘোটক হারাইআ সে জে হইঅেছে (১৫) কাতর :
অনেক কাগতি (১৬) করি বন্দিল বিস্তর :
জিজ্ঞাসিলো পীরো স্থানে শুন মোর বানী :
ঘোটক হারাইআ মোর আকুল জে প্রানী :
কি মতে পাইবো আমি ঘোরার উদ্দেস :
বির্বেচিআ (১৭) কহি শুন তাহার উপদেশ :

---

(১০) সত্য। (১১) 'সত্যপীরে চাই'—সত্যপীরের প্রতি চাহিয়া। (১২) তাঁহার। (১৩) দেখা, সঙ্গ। (১৪) যত। (১৫) হয়েছে, হইয়াছে। (১৬) কাকুতি। (১৭) বিবেচনা করিয়া।

তৎপরে ত্রৈলোক্যপীর কহিলেক বাণী :
ঘোটক পাইবা সাধু করহ সিন্নিনী : (১৮)
সাধু বলে কহ শুনী সীরিনীর ব্যবহার :
না জানী বৃত্তান্ত কিছু কহ সমাচার :
পির বলে শুন কহি সাধুর নন্দন :
ভক্তিজুক্ত হইয়ে শুন কহি সাহুর নন্দন :
আদি অন্ত কহিলেন জত বিবরন :
শুনীবা এ সব কথা হইঅে (১৯) ভক্তি মন :
তিন করার (২০) থার (২১) দিআ করিবে পুজন :
ভক্তিজুক্ত হইঅে সবে করিবে সেবন :
তিন করার থার দিবো নীঅম (২২) তাহার :
পুর্ণ ঘট জল দিবো ধান্য অম্রপর : (২৩)
আসা (?) আসন বস্ত্র সমুখেতে দিবো :
চৌদিগে লোক সব বেরিআ বসিবো :
পাঁচালী সমাপ্ত হইলে প্রসাদ বাটীব : (২৪)
ভক্তিজুক্ত হইঅে সবে প্রসাদ খাইব :
জে জনে অবজ্ঞা করে পাইবে তার ফল :
নীশ্চঅ (২৫) জানীঅ (২৬) আমি কহিলাম সকল :
মনেতে ভকতি করি সাহুর নন্দন :
তিন করার থার দিয়া পুজে ততক্ষন : (২৭)
মনের জথেক বাঞ্চা (২৮) সিদ্ধি হইলো মনে :
মনবাঞ্চা পুর্ণ হইলো পীরের কারনে :

— ০ঃ লাচারি ঃ০—

তুমি প্রভু দআময়ঃ (২৯) তুমি প্রভু নীরোদয়ঃ (৩০)
তুমি প্রভু অনাথের নাথ :
অখিল ভুবনদাতাঃ বিষ্ণুরূপে তুমি কর্ত্তাঃ
তুমি কর জিবের পালন :

---

(১৮) সিন্নী । (১৯) হইয়ে, হইয়া। (২০) কড়ির। (২১) গুড়। (২২) নিয়ম। (২৩) আম্রপল্লব। (২৪) বিতরণ করিবে। (২৫) নিশ্চয়। (২৬) জানিও। (২৭) তখন। (২৮) বাঞ্ছা। (২৯) দয়াময়। (৩০) নির্দ্দয়।

তুমি দেব নারাঅন ঃ নরলোক উদ্ধাবন ঃ
তুমি মোরে করহ নিস্তার ঃ (৩১)
ঘোটক হারাইআ পুনী ঃ কাতর হইয়েছি প্রাণী ঃ
কোন বুদ্ধি করিব এখন ঃ
দেবের দেবতা তুমি ঃ তোমাএ কি বলিব আমি ঃ
অল্পবুদ্ধি মনুষ্য জে জাতি ঃ
তুমি বর মহাজন ঃ না বুঝি তোমার মন ঃ
ঘোরা দিআ রাখ হে জিবন ঃ
জদি ঘোরা না পাই আমি ঃ তথাপিহ গতি তুমি ঃ
প্রাণ দিব তোমার উপর ঃ
কহে হরি নারাঅন ঃ পীরের চরণে মন ঃ
ভক্তি কর পাইবা ঘোটক ঃ ॥

পয়ার ছন্দং

পীরের জে সিরিনী করি ঘোটক পাইল ঃ
ঘোটক পাইয়া সাহু হরষিত হইল ঃ
নীত্য নীত্য ভাবে সাহু ত্রৈলোক্য পীর ঃ
ভক্তি ভাবে পূজা করে মনে করি এই স্থির ঃ
বিপদ খণ্ডঅ তার বারে ধন জন ঃ
মনবাঞ্ছা পুর্ণ্য (৩২) হইল পীরের কারন ঃ
হরি হরি বল সাধু আপন বদনে ঃ
কৃপার সাগর পীর কৃপা হইলো মনে ঃ
ভক্তি করি শুন সবে পীরের সমাচার ঃ
ভক্তি করিলে হএ (৩৩) সন্তুষ্ট অপার ঃ
তবে সাহু মনে ভাবি করিলেক সার ঃ
দেশেতে জাইতে সাহু হরিস (৩৪) অপার ঃ
পীরের সেবার জন্য প্রচার হইল ঃ
ভক্তি করি নরলোক পুজিতে লাগিল ঃ
পীরের কৃপাএ লোক বারে ধনে জনে ঃ
হস্তি ঘোরা আদি করি বাবে দিনে দিনে ঃ

---

(৩) নিস্তার। (৩২) পূর্ণ। (৩৩) হয়। (৩৪) হর্ষ।

সম্খেপে কহিল কিছু পীরের ইতিহাস ঃ
ভক্তি করি শুন সবে হরিরামদাস ঃ
অনুদ্দেশ হইএ জেবা ভির্ণ (৩৫) দেসে যাএ
পীরের স্বরন (৩৬) মাত্র উদ্দেস জে পাএ ঃ
কাঅমনোবাক্যে পুজা করে জেই জন ঃ
মনোরথ সিদ্ধি হয় পীরের কারন ঃ
পীরের পাচালী জেবা করে অবহেলা ঃ
নীশ্চয় জানীঅ ভাই জম (৩৭) ঘরে গেলা ঃ
সোনার ঘোরা রূপার জিনে ঃ
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর সিরিনীদিনে ঃ
আসিবেন ত্রৈলোক্য পীর বসিবেন খাটে ঃ
পীরের আজ্ঞা হইল সিরিনী বাটিতে ঃ

ইতি ত্রৈলোক্যপীরের পাচালী সমাপ্তঃ শ্রীঅখীলচন্দ্র শর্ম্মাঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকে অং ঃ।ঃ।।ঃ।ঃ

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

(৩৫) ভিন্ন। (৩৬) স্মরণ। (৩৭) যম।

বিমান বা ব্যোমযান

আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ আগ্নেয়াস্ত্র কামান-বন্দুকের কথা জানিতেন এবং তাঁহারাই উহাদের আদি উদ্ভাবয়িতা। সম্প্রতি এই প্রবন্ধেও দেখাইব যে, আমাদিগের পূর্ব্ব-পিতামহগণই জগতে সর্ব্বাদৌ বিমান বা ব্যোম-যানের উদ্ভাবন এবং উহার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন। এই যে পাশ্চাত্যগণ 'Europe' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, উহার নিদান আমাদিগের বেদের (৫।২৭।৬ম) "হরিযূপীয়া" শব্দ, তদ্রূপ ইউরোপের "বেলুন" শব্দেরও আসন্ন প্রসূতি আমাদিগের উপর্য্যুক্ত "বিমান" শব্দ। বিমানের বি—বে; ও মা—না—লু হইয়া পরে Baloon শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। পাশ্চত্যগণের বিমান 'আকাশপথ,' কিন্তু আমাদিগের বিমান "কামগমং মনোজবং হেমজালবিভূষিতং" ছিল।

আমাদিগের বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই এ "বিমান" শব্দের ভূরি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও প্রাচীনতম গ্রন্থেই "ব্যোমযান" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কেননা, ঐ সময়ে আদি স্বর্গের পরিচায়ক ভোম ব্যোম শব্দ শূন্য গগনে প্রোমোশন পাইয়াছিল না। খৃষ্ট হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ অমরসিংহ বলিতেছেন যে—

"ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী।"

ব্যোমযান ও বিমান (পুং ক্লীং) শব্দ একার্থবাচী। উহাদিগের অর্থ "গগনযান।" টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন যে—

"ব্যোম্নি আকাশে যান্তি অনেন
ইতি ব্যোমযানম্।"

যাহাতে আরোহণ করিয়া ব্যোম বা শূন্যগগনে যাতায়াত করা যায়, তাহারই নাম ব্যোমযান। তিনি বিমান শব্দের ব্যুৎপত্তিও এইরূপে করিয়াছেন—

"বি বিগতং মানং উপমা যস্য"

যাহার উপমা নাই, তাহারই নাম "বিমান।" কিন্তু আমরা তাঁহার এ সিদ্ধান্তে তথাস্তু বলিতে অনগ্রসর। আমরা মনে করি—

"বিঃ—পক্ষী পক্ষীব মন্যতে অনুমীয়তে
বা বিমানং (বিনাশে বা)।"

যাহা দূর হইতে পক্ষীর ন্যায় মনে হয়, উহারই নাম বিমান। বায়ুপুরাণের উক্তিও আমাদিগের এই উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। যথা—

"বিমানযানৈরাকাশং
পতত্রিভিরিবাবৃতম্। ৩৪।১১, অ—উ, খ।

বহু বিমানযান গগন ছাইয়া রহিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যেন, গগন পক্ষিসমূহ দ্বারা সমাবৃত হইয়া আছে।

ফলতঃ বিমান বা ব্যোমযানের আকার অনেকটা পক্ষীর ন্যায়ই ছিল। আমরা বাল্যকাল হইতে যে নারদের ঢেঁকীর কথা শুনিয়া আসিতেছি, উহাও ধানভানা ঢেঁকী নহে; পরন্তু বিমান। পাশ্চাত্যগণের Aeroplaneর আকারও কতকটা ঢেঁকীর মত। সুতরাং উহা সুদূর গগনে উড্ডীন হইলে যে পক্ষীর মত অনুমিত হইবে, ইহা বিচিত্র বা অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, সর্ব্বাদৌ কোন্ গ্রন্থে এই ব্যোমযান শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। তবে অমর যে নিগম বা শিষ্টপ্রয়োগ সন্দর্শনানন্তর উক্ত শব্দ স্বীয় কোষে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ধ্রুবই। পণ্ডিতেরা বলেন ও দেখাও যায় যে, অমরসিংহ অগ্নিপুরাণকে আদর্শ করিয়া আপনার কোষের দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত অগ্নিপুরাণেই আমরা এই ব্যোমযান শব্দ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—

"ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী পীযূষমমৃতং সুধা॥" ৯৫১ পৃ

সুতরাং বেশ জানা গেল যে,অগ্নিপুরাণ—আদর্শ ও অমরসিংহ—অনুকারী। যাহা হউক, অগ্নিপুরাণ কোথা হইতে এই তথ্যের সমাহার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

আচ্ছা,আমরা বুঝিলাম যে, বিমান বা ব্যোমযান যেন গগনযান; কিন্তু ইহা যে গগনগমনে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ কোথায়? আমরা বায়ুপুরাণ হইতে যে একটি শ্লোকার্দ্ধের অধ্যাহার করিয়াছি, উহাই এ বিষয়ের প্রথম প্রমাণ। অন্যান্য বহু প্রমাণ দ্বারাও আমরা বিমান বা ব্যোমযান যে গগনযান, তাহা সপ্রমাণ করিব। বায়ুপুরাণ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"ততস্তস্য মখে দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা॥" ৯৫

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ দক্ষের যজ্ঞে গমন জন্য একমত হইলেন। তথা হি—

"স্বৈর্বিমানৈর্মহাত্মানো জ্বলন্তি জ্বলনপ্রভাঃ।
দেবস্যানুমতেঽগচ্ছন্ গঙ্গাদ্বারে ইতি শ্রুতিঃ॥" ৯৬।৩০ অ

এবং ইন্দ্রের অনুমতি অনুসারে অন্যান্য দেবগণ আপন আপন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইলেন।

গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থানের নাম "গঙ্গাদ্বার।" আমরা কনখলে যাইয়া এই দক্ষযজ্ঞের

স্থান অবলোকন করিয়াছি। সকলে বলিলেন যে, এখানে দক্ষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখন বায়ুপুরাণের বচন দ্বারাও উঁহাদিগের উক্তি সমর্থিত হইতেছে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, দেবতারা বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব "বিমান" বা "ব্যোমযান" নিরঙ্কুশ কবিগণের কল্পনা-মহাসাগরের ফেন-বুদ্বুদ নহে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বা দেবীমাহাত্ম্যে বিবৃত আছে যে—

"যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান যোদ্ধুমায়যৌ॥" ১৩

যে দেবতার যে প্রকার রূপ ও যেরূপ বাহন, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণও সেই প্রকার রূপে ও সেই বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে রণাঙ্গনে আসিয়াছিলেন।

"হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥" ১৪।৮৮ অ

ব্রহ্মার স্ত্রী ব্রহ্মাণী হংসযুক্ত বিমানের অগ্রভাগে উপবেশন করিয়া আগমন করেন। তাঁহার করে অক্ষমালা ও ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছিল।

ব্রহ্মার বিমানে হংস কেন? ব্রহ্মা হংসবাহন ছিলেন, তজ্জন্য? হাঁ, তজ্জন্যই বটে। তবে ব্রহ্মা হাঁসে চড়িতেন না, শিবও বুড়া বলদে চড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন না। ফলতঃ শিব বৃষভাখ্য দেবগণের নেতা (Leader- -নেতারঃ) ছিলেন, তাই তাঁহার বিমানে বৃষভমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত; ব্রহ্মাও হংসাখ্য দেবগণের নেতা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিমানেও হংসমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল।

তবে কি শিবেরও বিমান ছিল? নারদ ও ইন্দ্রাদি সকল দেবতারই বিমান ছিল। যদুক্তং মহর্ষি-বায়ুনা—

"বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্‌ভিঃ শততত্তৈর্দিবৌকসাম্।
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুং পর্ব্বণি পর্ব্বণি॥" ৬৮।৩৪ অ

মেরুপর্ব্বতের প্রত্যেক পর্ব্বে পর্ব্বে দেবগণের প্রভাসন্দীপ্ত শত শত শ্রীমান্ বিমান সকল বিরাজ করিত।

"তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা॥" ৭৩।৩৪ অ

ঐ সকল বিমান-সমূহের মধ্যে শিবের বিমান আকারে অতীব বৃহত্তম ছিল, এবং উহা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ছিল।

শিব ত বিমানে চড়িতেন না, বুড়া বলদে চড়িয়া বেড়াইতেন? "ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া?" হাঁ, অন্নদামঙ্গলাদিতে ঐরূপই আছে বটে, কিন্তু শিবের বলদ ছিল না, বিমান ছিল, উহাতেই সে চিহ্ন থাকিত। উক্ত রামায়ণে --

"ততো বৃষভমারুহ্য পার্ব্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্॥" ২৭।৪ সর্গ, উ, খণ্ড।

অনন্তর শিব পার্ব্বতীর সহিত বৃষভে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুমার্গে যাইতে যাইতে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

বায়ুমার্গে শব্দের অর্থ বায়ুপথ গগন। সুতরাং বৃষভধ্বজ শিব যে বৃষভচিহ্নাঙ্কিত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যাইতেছিলেন, ইহা ধ্রুবই।

আচ্ছা, দেবতারা বিমানবিহারী ছিলেন, ইহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু ভারতবাসীরা কখনও বিমানারোহণ করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ কোথায়?

এরূপ প্রমাণ আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই। উহার একত্র বিবৃত আছে যে—

"এবমুক্তস্তু রামেণ
রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশং
আজুহাব ত্বরান্বিতঃ॥" ২৩॥

রাম এইরূপ বলিলে রাক্ষসকুলকেতু বিভীষণ অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া সূর্য্যসঙ্কাশ বিমান আনয়ন করাইলেন।

"উপস্থিতং অনাধৃষ্যং
তদ্বিমানং মনোজবম্।
নিবেদয়িত্বা রামায়,
তস্থৌ তত্র বিভীষণঃ॥"২৯

উক্ত বিমান অধর্ষণীয়, উহার গতি মনের ন্যায় অতি দ্রুত। উহা উপস্থাপিত হইলে বিভীষণ রামচন্দ্রকে জানাইলেন।

"তৎ পুষ্পকং কামগমং বিমানং,
উপস্থিতং ভূধরসন্নিকাশম্।
দৃষ্ট্বা তদা বিস্ময়মাজগাম,
রামঃ সসৌমিত্রিরুদারসত্ত্বঃ॥" ৩০। ১২১ সর্গ

উক্ত পুষ্পকরথ কামগম ও পর্ব্বতসঙ্কাশ, উদারসত্ত্ব রাম ও সৌমিত্রি উহা দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন।

"অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ
তদ্‌বিমানমনুত্তমম্‌।
হংসযুক্তং মহানাদং
উৎপপাত বিহায়সম্‌॥" *।১২৩ সর্গ, যুদ্ধকাণ্ড

অনন্তর রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে সেই হংসচিহ্নযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান গভীর ধ্বনি করিতে করিতে গগনে উড্ডীন হইল।

এই পুষ্পকরথ কুবেরের ছিল। রাবণ তাঁহা হইতে উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ইন্দ্রজিৎ উহাতে আরোহণ করিয়া মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। যদাহ রামায়ণম্‌—

"অন্তরিক্ষং নিরীক্ষন্তো
দিশঃ সর্ব্বাশ্চ বানরাঃ।
ন চৈনং মায়য়া চ্ছন্নং
দদৃশূ রাবণিং রণে॥" ৮।৪৬ সর্গ, যুদ্ধকাণ্ড

রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতেছেন, অথচ বানরগণ গগনে বা চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। কেননা, তিনি পুষ্পকারোহণে আকাশে থাকিয়া অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

হাঁ, রামচন্দ্র ও ইন্দ্রজিৎ মনুষ্য হইয়াও বিমানারোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পুষ্পকরথ ত দেবগণের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ছিল? মনুষ্য বা ভারতবাসীরা ত বিমানারোহণ করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। আমরা কলিযুগের মহাভারতেই তাহা দেখিতে পাইতেছি।—

"উপায়াৎ ভরতশ্রেষ্ঠ
শাল্বো দ্বারবতীং পুরীম্‌॥২
অরুন্ধৎ তাং স দুষ্টাত্মা
সর্ব্বতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শাল্বো বৈহায়সং চাপি
তৎ পুরং ব্যূহ্যধিষ্ঠিতঃ॥" ৩।১৫ অ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! সেই দুষ্টাত্মা শাল্ব স্বকীয় 'বৈহায়স' বা বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাপুরীতে যাইয়া নিজে আকাশে থাকিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা দ্বারকা অবরুদ্ধ করিয়া রহিল।

"স ব্যোমযানমস্তো বৈ
কামগাদবরুহ্য চ।

* কালিদাস রঘুবংশের ১৩শ সর্গে এই বিমানের কথা বলিয়াছেন।

প্রদ্যুম্নং যোধয়ামাস
শাল্বঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।" ১০।১৭ অ. বনপর্ব্ব

অনন্তর রোষমদমত্ত পরপুরঞ্জয়কারী শাল্ব সেই কামগ বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ভূমিতে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

শাল্বরাজ আমাদিগের ভারতীয় ক্ষত্রিয় এবং তিনি সহদেব ও নকুলের মাতুল ছিলেন; সুতরাং ভারতীয় রাজন্যবৃন্দও যে বিমান ব্যবহার করিতেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

আচ্ছা, এই সকল বিমানের নির্ম্মাতা কে ছিলেন? যে প্রকার দেবশিল্পী ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র ও বিমানের নির্ম্মাতা ছিলেন, তদ্রূপ ভারতীয় শিল্পিগণও গৃহে গৃহে লৌহময় বজ্র * (কামান) ও বিমান প্রস্তুত করিতেন। তবে আমরা ভারতে বিমান-নির্ম্মাণের প্রমাণ এখনও পাই নাই—ভারতে ব্যবহারের প্রমাণমাত্র প্রদর্শিত হইল। কালে ঐ সকল গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আচ্ছা, বুঝিলাম, এ দেশেও বিমানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল; কিন্তু বেদে বিমান শব্দ বা বিমানের ব্যবহার দেখা যায় না কেন? যজুর্ব্বেদে আছে—

"বিমান এষ দিবো মধ্যে আস্তে
আ পপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
স বিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীঃ,
অন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্ ॥" ৫৯।১৭ অ

অবশ্য, উবট ও মহীধর এই বিমান শব্দের অর্থ বিশ্বনির্ম্মাতা সূর্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সে অতীব কবিকল্পনাপ্রসূত। আমরা মনে করি, এই বিমান শব্দের অর্থই "ব্যোমযান"।

"পুরাণং বেদসম্মিতম্"

পুরাণ সকল বেদানুকারী; সুতরাং বেদতুল্য। যাহা বেদে ছিল না বা নাই, তাহা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে আসিবে কোথা হইতে? আমাদিগের মতে উক্ত মন্ত্রের অর্থ যেন ইহাই—

এই বিমান আকাশের মাঝখানে বিরাজমান। ইহা যেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন লোক পূর্ণ করিয়া (যুড়িয়া) রহিয়াছে। উহা অর্থাৎ উক্ত বিমান (বিমানস্থ লোক সকল) বিশ্বসংসারের স্থল ও জলভাগ (ঘৃতাচীঃ—ঘৃত জল ও বরফ) সকলই দেখিতে পাইতেছে (অভিচষ্টে)। আর ইহা পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমাও যেন অবলোকন করিতেছে।

আচ্ছা, এ একটা বৈদিক প্রমাণ বটে, কিন্তু অর্থ বড় সহজ নহে। আর কোনও বৈদিক প্রমাণ নাই কি? আছে বই কি? কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাষ্যকারেরা কাহাকেও বেদের

---

* ঢাকায় চকবাজারের কামান ভারতীয় লৌহকার দ্বারা নির্ম্মিত। নেপালের ও কাবুলের কামান ভারতীয় কর্ম্মকারেরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

প্রকৃতার্থ বোধে অবসর প্রদান করেন নাই। আমরা ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে বিমানের কথা পাইয়াছি। প্রবন্ধ বড় হইবে বলিয়া কেবল একটি প্রমাণের অধ্যাহার করিব।

"খেরথস্য খেঽনসঃ খেযুগস্য শতক্রতো।
অপালামিন্দ্র ত্রিঃ পূত্ব্যকৃণোঃ সূর্য্যত্বচম্" ॥৭।৮০।৮ম্

তত্র শাট্যায়নব্রাহ্মণম্…তাং খেরথস্য অধ্যবৃহৎ সা গোধা অভবৎ; তাং খেঽনসঃ অত্যবৃহৎ, সা সংশ্লিষ্টকায়া অভবৎ; তদেষা অভ্যনূচ্যতে খেরথস্য খেনস ইতি।

শাট্যায়ন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে, ইন্দ্র অপালাকে রথের ছিদ্রের (খের) উপরে দিয়া টানিয়া বাড়াইলেন (অবৃহৎ—বৃহ বৃদ্ধৌ)। তাহাতে অপালা গোধার ন্যায় লম্বা হইয়া গেলেন কিংবা তাঁহার দেহ উজ্জ্বল হইল (গাং কিরণং ধত্তে ইতি গোধা)। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে শকটের ছিদ্রে ফেলিয়া টানিলেন, তাহাতে তাঁহার দেহ সংশ্লিষ্ট বা সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ হইয়া গেল।

তত্র সায়ণঃ…অনয়া অপালাং সূর্য্যসদৃশপ্রভাং অকরোৎ ইত্যাহ—হে শতক্রতো হে শতসংখ্যকযজ্ঞ বহুবিধপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র। রথস্য স্বকীয়স্য খে পৃথুতরে ছিদ্রে, তথা অনসঃ শকটস্য খে তদপেক্ষয়া অল্পে ছিদ্রে যুগস্য খে চ অল্পতরে সূক্ষ্মে ছিদ্রে রথশকটযুগানাং ছিদ্রেষু ত্বগ্দোষপরিহারায় ত্রিঃ ত্রিবারং নিষ্কর্ষেণ পূত্বী পূত্বা শোধয়িত্বা ততঃ অপালাং এতন্নামিকাং অত্রিসুতাং ব্রহ্মবাদিনীং সূর্য্যত্বচং সূর্য্যসমানত্বচং অকৃণোঃ অকরোঃ কল্যাণতমরূপভাজং অকরোঃ ইত্যর্থঃ। ৭।৮০।৮ম

হে শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি প্রথমে অপালাকে তোমার রথের 'খে' বা বড় ছিদ্র দিয়া, পরে শকটের তদপেক্ষা ছোট ছিদ্র দিয়া, পরে যুগের তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া তিনবার টানিয়া (নিষ্কর্ষেণ) তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা করিয়াছিলে।

বঙ্গানুবাদ…হে শতক্রতু, তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার নিষ্কর্ষণ দ্বারা শোধন করতঃ অপালাকে সূর্য্যসমান চর্ম্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে ৭।৯১।৮ম।

Grassman—Thou, O Indra! didst, O strong one, pull Apala through three holes, that of the wheel, the cart and yoke, and her skin thereupon became bright as the Sun.

Ludwig—In the hole of the chariat, in the hole of a cart and in the hole of the yoke, O Satakratu, thou hast, O Indra, purifying Apala thrice made her body shining like the Suns.

সুধীর পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিবেন, উপযুক্ত ব্যাখ্যাকদম্বক সারগর্ভ কি দোষসমাক্রান্ত।—যে প্রকার স্বর্ণকার বা লৌহকারেরা লৌহখণ্ডস্থ ছিদ্রের ভিতর দিয়া স্বর্ণ বা লৌহ-তার টানিয়া উহাদিগকে সরু ও উজ্জ্বল করে, তদ্রূপ কি কেহ গাড়ীর বড়, মেজো ও

সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া মানুষ টানিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিতে পারে ? অতি কদর্য্য ব্যাখ্যা।

প্রকৃতার্থ কাহিনী…হে শতক্রতো শতমখ ইন্দ্র, খেরথস্য (ব্যত্যয়েন) খেরথঃ (খে শূন্যে রথো বিমানং যস্য) খেহনসঃ (ব্যত্যয়েন) খেহনাঃ (খে শূন্যে অনঃ শকটং যস্য সঃ) খেযুগস্য (ব্যত্যয়েন) খেযু (খে শূন্যে যুগং রথাঙ্গবিশেষো যস্য সঃ) ত্বং বিমানবিহারী ত্বং বিমানা-রোহণেন ভারতবর্ষমাগত্য ত্রিঃ পূত্বী ত্রিঃ পূত্বা ত্রিবারং ঔষধপ্রয়োগেণ শোধয়িত্বা চর্ম্মরোগং দূরীকৃত্য অপালাং অগস্ত্যপত্নীং সূর্য্যত্বচং সূর্য্যবৎ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাং অকৃণোঃ অকরোঃ কৃতবান্ অসি।৭।৮০।৮ম

হে শতমখ ইন্দ্র! তুমি তোমার খেরথ খে-অনঃ ও খেযুগ অর্থাৎ বিমান আরোহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক তিনবার ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা অপালাকে চর্ম্মরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সূর্য্যবৎ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা করিয়াছ।৭।৮০।৮ম

ইহার পরও কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুরা কামান, বন্দুক ও বিমানের ব্যবহার জানিতেন না? আমরা ইহার পর দেখাইব যে, আমরা যুদ্ধকালে সৈন্যদিগের জন্য গর্ত্ত বা trench খনন করিতাম, যুদ্ধে বিদ্যুতের তার, গ্যাস শতঘ্নী ও জলস্রোত (বরুণাস্ত্র)ব্যবহৃত হইত; এবং আমরা ইহাও দেখাইব যে, আমরা বাইসাইকেল (দ্বিচক্রযান) ও ট্রাইসাই-কেল (ত্রিচক্রযান) প্রভৃতিরও নির্ম্মাণ ও ব্যবহারে সুদক্ষ ছিলাম। আমরা কাষ্ঠময় পক্ষযোগে আকাশে উড্ডীয়মান হইতাম। আমাদিগের নির্ম্মিত লৌহময় বর্ম্ম সকল মহাসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশদেশান্তরে যাতায়াত করিয়া সর্ব্বত্র ভারতীয় সভ্যতার বিঘোষণা করিত। ফলতঃ

"যদিহাস্তি তদন্যত্র
যন্নেহাস্তি ন তৎ কচিৎ।" চরক ও মহাভারত

যাহা ভারতে ছিল, তাহাই অন্যত্র গিয়াছে; যাহা এখানে ছিল না, তাহা অন্যত্রও বিদ্যমান নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সমালোচনা

পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়

এবার আশ্বিনের ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গ মৃতপ্রায়। পূর্ব্ববঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই ঝড় চলিয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন যে, প্রথমে বঙ্গোপসাগরে এই ঝড় উত্থিত হয়, সেখান হইতে বাঙ্গলায় প্রবেশের পথে প্রথম খুলনা জেলার দক্ষিণভাগ আক্রমণ করে। পরে খুলনার সদর সবডিবিসনের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমস্ত গোপালগঞ্জ মহকুমা, মাদারিপুর মহকুমা এবং ফরিদপুর জেলার সদর সবডিবিসনের উপর দিয়া গমন করে। পরে বিশাল পদ্মানদী ও তাহার চরভূমির উপর দিয়া মুন্সীগঞ্জ মহকুমা অতিক্রম করে। তার পর মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটা থানার উপর দিয়া ঢাকা জেলার সমগ্র সদর ও নারায়ণগঞ্জ পার হইয়া যায়। অবশেষে ঝড় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করে। সেখানকার সমগ্র কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা মহকুমার দক্ষিণার্দ্ধের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। অনুমান এইরূপ যে, ৫০ মাইল বিস্তৃত স্থানের উপর দিয়া এই আশ্বিনের ঝড় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় এমন ঝড় আমরা আর দেখি নাই। ঝড়ে এমন বিপন্ন বাঙ্গালী আর কখনও হয় নাই। মানুষ মরিয়াছে—কেহ তাহার সংখ্যা করিতে পারে নাই। পশুপক্ষী মরিয়াছে,—কেহ তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই। ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, পড়িয়াছে, উড়িয়া গিয়াছে, কোন কোন পল্লীতে মনুষ্য-আবাসের অস্তি অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। গাছপালা ঝড়ে উড়িয়া খালবিলে পড়িয়া জলের স্রোত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মৃত মনুষ্য-দেহ ফুলিয়া নদীতে ভাসিয়া উঠিয়াছে, সে করুণ অথচ ভীষণ দৃশ্য যে দেখিয়াছে, তাহারই হৃদয়ের শোণিতপ্রবাহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহা দৈবের বিড়ম্বনা, ইহা দুর্ভাগা বাঙ্গালীর ললাটলিখন।

সংসারে দৈব আছে, পুরুষকারও আছে। বাঙ্গালী প্রধানেরা এবারে দৈবের বিরুদ্ধে তাহাদের পুরুষকারকে কথঞ্চিৎ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সমর্থও হইয়াছে। ইহা আশার কথা। ইহা দেখিয়া আমরা এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যেও একেবারে হতাশ হইতে পারি নাই।

যাঁহারা এই ঘোর বিপৎকালে রাত্রিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দশের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, নিজেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, আর

যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা দুঃস্থ ও বিপন্ন গ্রামবাসীদের আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্ত। তাঁহারা আমাদের মাথার মণি। সমগ্র জাতিটার মধ্যে তাঁহারাই সারবস্তু।

মহাপ্রাণতা, মহানুভবতা চিরকালই সংসারের মহান্ ক্লেশ-সমূহকে বরণ করিয়া চলে। বাঙ্গলার অনেক বড় বড় দুঃখ আছে। বাঙ্গালী প্রধানেরা জাতির সেই বড় বড় দুঃখের অতি অল্প অংশই বহন করিয়া থাকেন। জাতির দুঃখের ভাগ তাঁহারা বহন করেন না বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত জননায়ক হইয়া উঠিতে পারেন না। আজ এই ঝড়ের মুখে আগুয়ান হইয়া, যাঁহারা বুক দিয়া বিপন্নকে ত্রাণ করিবার জন্ম ছুটিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা সত্যই নেতা, কেননা, বিপদের পুরোভাগেই তাঁহাদের শির উন্নত দেখিতেছি। ঝড়ের মুখে, জাতির সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুখে, এমনি যাঁহাদের শির উন্নত দেখিব, আমরা তাঁহাদিগকেই নেতা বলিয়া জানিব ও মানিব। বাঙ্গলার এই ঝড়ে আমাদিগকে চিনাইয়া দিল যে, আমাদের নেতা কে,—এবং কে নয়।

শ্রীঃ—

(অগ্রহায়ণ ১৩২৫ হইতে কার্ত্তিক ১৩২৬)

৫ম বর্ষের সূচীপত্র।

(বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক)